(জাতীয় বিবিধ প্রসঙ্গসহ।)

আর্য্যনারী বামাসুন্দরী দেবীর চরিত্র !

যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি আগত্যাভিনয়ন্তি চ।
নাট্যান্তে পুনর্যেন তস্মৈ তেভ্যো নমো নমঃ ॥

যাহা হইতে সকল জীব আসিয়া অভিনয় করিতেছে। এবং অভিনয়ান্তে পুনশ্চ যিনি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন, সেই নাট্যধর ও সেই অভিনেতৃবর্গকে বার বার নমস্কার।

কলিকাতা,
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্ম মিশন্ প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিক চরণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সং ১৩০৭ সাল।

মূল্য ০ আনা ২:৫

বিজ্ঞাপন।

সকল দেশেই নরনারীর চরিত্র দেশীয় আচার ক্রিয়া ধর্ম্ম ও প্রচলিত রীতি নীতিদ্বারা সংগঠিত; এমন কি, ক্রীড়া কৌতুক ও আমোদ প্রমোদটী পর্য্যন্ত জাতীয় রুচি অনুসারে বিভিন্ন আকারে নরনারীর মধ্যে প্রতিনিয়ত অভিনীত হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই চির অভিনেয় জাতীয় জীবনের অনেক কথা আমি আর্য্যা বামাসুন্দরীর চরিত্রে লিপিবদ্ধ করিলাম। অবশ্যই বিস্তারিতরূপে সেই অভিমত সমস্ত কথা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণন করা অসম্ভব। তথাপি আর্য্য-নারীর অমূল্য অলঙ্কারস্বরূপে জাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মের মর্ম্ম ও আর্য্য ঋষিদিগের অতুল জ্ঞান বিভূতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস আমি ইহার স্থানে স্থানে অত্যাদরে সন্নিবেশিত করিলাম। বিশেষতঃ ভারত-রমণীর নিত্যাকরণী ব্রতচর্য্যা ও আর্য্যতার চিহ্ন স্বরূপ হিন্দুমাত্রের জীবনগত বেদাচার বা বেদবিহিত দশকর্ম্ম এবং গৃহস্থগণের অবশ্যকরণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পুণ্যভূমি ভারত প্রতিষ্ঠিত পঞ্চোপাসনা ও জ্ঞানের চরমোৎকর্ষতার দ্যোতক প্রতিমা ও শালগ্রাম পূজার প্রবর্ত্তনা অবতারপ্রসঙ্গ, গঙ্গা এবং তুলসী মাহাত্ম্য ও পঞ্চগব্যাদি যে সমস্ত বিষয়ের মর্ম্ম অবগত না থাকায় বিদেশীয়দিগের চক্ষে দূষণীয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিক্ষিত সমাজে ও প্রায় অনেকেই যাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থা নাই, আমি তাহারই

বাছিয়া বাছিয়া অতি আদরের সহিত বর্ণনা করিলাম। আমার মতে দেশের এই সমস্ত বহুমূল্য ভাল জিনিস তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, বরং যত্নপূর্ব্বক একটু পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বসাধারণের রুচিকর করিয়া লইতে পারিলেই লাভ। আমি বিবেচনা করি, দেশের চিন্তাশীল কৃতবিদ্যগণ আমার এই সংক্ষেপ উক্তিগুলি আরও একটু বিস্তৃত ও জ্ঞান প্রভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করিলে দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই ইহার সমুচিত গৌরব ও প্রকৃত সমাদর হইতে পারে।

আমার এই মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে বিনামূল্যে দেশের পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর্গকে পঞ্চাশৎ পুস্তক সাদরে প্রদত্ত হইবে। তদ্ভিন্ন বন্ধুবর্গ এবং দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে পঞ্চাশৎ, মাননীয়া মহিলাবর্গকে পঞ্চাশৎ ও নানাস্থানের ছাত্রবর্গকে পঞ্চাশৎ পুস্তক বিনামূল্যে প্রদান করা যাইবে। আর অবশিষ্ট পুস্তক বিক্রয়ার্থ কলিকাতায় থাকিবে। মূল্য—॥০ আনা; এবং উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধান পুস্তকের মূল্য—৸০ আনা। ইতি ২৯শে শ্রাবণ ১৩০৭ বাং।

শ্রীভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
শিলচর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডপণ্ডিত

আর্য্যনারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও জীবন প্রবর্ত্তনা।

যদিও আমার আত্মগত কথা ও ভাবরিমিশ্রিত করিয়া একটী অভিমত নারীচরিত বর্ণন করাই আমার এই পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্য তথাপি ইহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদে সাধারণভাবে এমন অনেক কথার সন্নিবেশ থাকিবে, যাহা দেশের চিন্তাশীলা বুদ্ধিমতীদিগের আলোচনায় আসিলে নিশ্চয়ই কথঞ্চিৎ উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

আর সকলেই জানেন, অধুনা প্রায় নগরে নগরে ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারিকা মহিলাগণ বিচরণ করিতেছেন। তাহারা অনেক সময়েই দেশীয় মহিলাগণের নিকট যাইয়া দেশের আচার নিষ্ঠা ও ধর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এবং তাঁহাদের সরল ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ও উদ্যোগ নিশ্চয়ই দেশের নিতান্ত অকল্যাণকর; মনে সংশয় রাখিয়া অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও মনে সুখ ও প্রকৃত আনন্দ হয় না। প্রকৃত পক্ষে ঐটী লক্ষ্য করিয়াই আমি ইহার অধ্যায়ে অধ্যায়ে এতদ্দেশের সদাচার ও যুগযুগান্তর হইতে কথিত সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মের বার্ত্তা, সন্নিবেশিত করিতেছি। নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিলে ঐ বিদেশীয়া ধর্ম্মোৎসাহিনী সুসভ্যা মহিলাগণও তদ্দর্শনে সুখী এবং আশ্চর্য্যান্বিতা হইবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা আমাদের অমিত্র নন, প্রভূত রূপে মঙ্গলসাধন করিয়া দিতেই কটিবন্ধন করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং লিখিতব্য বিষয়ে যদি বাস্তবিকই কিছু সৌন্দর্য্য বা সত্য থাকে, তবে তাহাতে তাঁহাদের মোহিত না হইবার কথা কি আছে?

তাহার পর অবশ্যই কল্পনা নয়, অত্যুক্তিও নয়, পৃথিবীর সভ্য লোক মাত্রেই জানেন, ভারতবর্ষ একটী প্রাচীন রাজ্য ইহাতে কত অসংখ্য জ্ঞানী কর্ম্মী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সদ্‌গৃহস্থের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহাদের সহধর্ম্মিনীসকল জীবনাভিনয় করিয়া গিয়াছেন। এবং যাহাদের রুচি প্রবৃত্তির উপর নিঃস্বার্থ অরণ্যাচারী চিন্তাশীল ঋষিবর্গ সর্ব্বদাই নেতৃত্ব করিয়াছেন। আর যে জাতির আযাত্য, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তনা ও পাণ্ডিত্যে জর্ম্মণ দেশীয় মোক্ষমূলার প্রধান পণ্ডিতকুলও বিমুগ্ধ, সেই দেশের

বা সেই জাতীয় নারীচরিত্রে যে, কিছু শিক্ষনীয় ও দর্শন-যোগ্য আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, বিদেশীয় অনেক মহাত্মা ভারতনারীর প্রকৃত মহিমা না জানিয়া অনেক সময়ে বিদ্বেষ তূলিকাতে এতদ্দেশের নারী-চিত্র অঙ্কিত করিয়া পৃথিবীর লোককে দেখাইয়াছেন, কিন্তু আমি বলি, তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল, যে বাঙ্গালার নারীসমাজের মূল আদর্শ সতী, সীতা ও সাবিত্রী, এবং সামাজিকদিগের রুচি বিশোধনার্থ কাব্য নাটকাদিতে প্রদর্শনীয়া তপোধনকন্যা শকুন্তলা ও পতির ধর্ম্মঋণ পরিশোধনার্থ আত্মবিক্রয় কারিণী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পত্নী শৈব্যা প্রভৃতি অতি সম্মানিতা নারীকুল; আর পবিত্র তপোবনের শোভাসম্পাদিকা মহর্ষি বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী ও যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের একাসনে সমাসীনা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি দেবীগণ; সেই দেশের নারীচিত্র যেমন তেমন করিয়া আঁকিলে হইবে কেন। তাহাতে বরং নিজেরই অনভিজ্ঞতা প্রকাশিত হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে তাঁহাদেরও বিশেষ কোন দোষ নাই, দূরে থাকিয়া প্রবেশ চক্ষে বা কাঁচ-যন্ত্রে দৃষ্টি করিলে কোন বস্তুরই প্রকৃত দর্শন হয় না।

যাহা হউক এই পুস্তকে এই ক্ষণে যে একটী কল্যাণময়ী নারীর জীবন সন্নিবেশিত করিতেছি, সেই সামান্যা মানবী বা দেবীর জন্ম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সরিপপুর গ্রামের কোন একটী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে। এই বালিকার জন্মের

পূর্ব্বেই তদীয় পিতৃদেব গৌরচন্দ্র চৌধুরী স্বর্গারোহণ করেন। জানিনা, পিতার মৃত্যুর পর ঐ ভগ্ন ও একান্ত মনঃক্ষুণ্ণ পরিজনদিগের মধ্যে এই একটী কন্যাসন্তানের উপস্থিতি কতদূর আনন্দকর হইয়াছিল। অবশ্য ঈশ্বরীয় বিধানে কন্যা-পুত্র দুইই সমান এবং পিতামাতারও তুল্যরূপ আদরের জিনিস। তথাপি লৌকিক ব্যবহারে যে, ইহাদের একেবারেই পার্থক্য নাই, এই কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না। একজন সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন, "কন্যা জন্মিবামাত্রেই প্রথমতঃ একটী বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার পর কোথায় কাহার নিকট সমর্পিতা হইবে, ইহাই মহান্ বিতর্কের বিষয় হইয়া থাকে। আবার প্রদান করিলেও সেই দত্তা কন্যার জীবন সদাই পরায়ত্ত, সুতরাং কন্যা নিশ্চয়ই পিতৃকুলের পরিতাপের হেতু।" এই নির্দ্দেশটী একভাবে অবশ্যই সত্য, বাৎসল্য দৃষ্টিতে চাহিলে ঠিক এইরূপই প্রতীত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা নিতান্তই এক সুখের বিষয় যে, যে দেশে এই কন্যার জন্ম ও যে আর্য্যভূমিতে ইনি উপস্থিতা সেই রাজ্যের ব্যবস্থাপকগণ কন্যাদিগকে অতি সমাদরে ও সসম্মানে সামাজিকদিগের নিকট ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। এতদ্দেশের একজন প্রাচীন সংহিতাকারের উক্তি এই, "যদি শীলতাবিবর্জ্জিত না হয়, অর্থাৎ দুঃশীলা না হয়, তবে একটী কন্যা দশজন পুত্রের সমান।" আবার অন্য একজন ঋষির নির্দ্দেশ এই, "যথোক্ত বাহ্মবিধানে একটী কন্যা সৎপাত্রে

সমর্পিতা হইলে, সেই কন্যা হইতে উপজাত সন্তান একবিংশতি পুরুষ পবিত্র করিয়া থাকে।" বোধ করি এই স্থানে জ্ঞানী পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না যে এই সমস্ত কথার হেতুবাদও অবশ্যই আছে; সামান্য কথা নয় এই এক একটী কন্যাই এক এক বংশের প্রবর্ত্তিকা হইয়া আর্য্যজাতির পবিত্র শোণিত বহন করিয়া দিয়া যাইতেছেন। সুতরাং এই উল্লিখিত শুধু কথন দ্বারাই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, কন্যা-সন্তানদিগের প্রতি আর্য্য মনীষীদিগের হৃদয়ের ভাব কত উচ্চ।

তাহার পরেও যদি কেহ এই সমস্ত শুধু মুখের কথা বা কেবলই স্তুতিবাদ মাত্র মনে করেন, তবে তিনি আর্য্যজাতির জীবন তুলিকাতে অঙ্কিত পুণ্য তীর্থ কাশীধামের উপরে একবার দৃষ্টি করুন; তাহা হইলেই বাস্তবিক বুঝিতে পারিবেন, নারীজাতির এমন দৃশ্য এমন আদর বা এমন উচ্চ সম্মান আর কোথাও আছে কিনা। তথায় নারীর বাল্যযৌবন ও বার্দ্ধক্য এই তিন অবস্থারই জীবন্ত মূর্ত্তি স্থাপিত। সেই পুণ্যক্ষেত্রে কুমারীর পূজা, সধবার ভোজন ও বিধবার যোগ তপস্যা, এই তিনটীই অনিমেষনয়নে দেখিবার যোগ্য। কুমারীগণ নির্বিকার পবিত্রা দেবীমূর্ত্তি, এই জন্য আর্য্যসন্তান এই স্থানে এই বিশ্বেশ্বরের নামে রচিত ধর্ম্মক্ষেত্রে কুমারীর পূজা করিয়া আনন্দ লাভ করেন। আর সধবা নারী ভোগময়ী মূর্ত্তি, এই জন্য সধবা ভোজন কাশীধামে

একটী প্রসিদ্ধ সংক্রিয়া। তদ্ভিন্ন বিধবা নিস্পৃহা ও ভোগ-বিনির্ম্মুক্তা নিবৃত্তিরূপা নারীর তপোময়ী মূর্ত্তি, নিয়ত জপতপ করিয়া পরমার্থ চিন্তনে জীবন ক্ষয় করাই তাঁহাদের আদর্শ-ভাব। ইঁহারা স্বরূপতঃ যতি ও ব্রহ্মচারীরই সমকক্ষা ও সমান মাননীয়া। অধুনা শিক্ষিত লোক মাত্রেরই একটী ধারণা এই যে, যাহারা নারীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে জানেন না, তাঁহারা বাস্তবিক সভ্য নহে। ফলে এই সূত্র ধরিয়া সভ্যতা নির্ণয় করিতে হইলে আর্য্যজাতি যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা এমন দেবভাবে নারীজাতির সম্মান করিতে আর কোথাও কাহাকে দেখা যায় না।

এর উপরে আর্য্যদিগের মনোরাজ্যে প্রবেশ করিলে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই তিনটী আদর্শনারী ভাব আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক ভাবনাতেও সন্নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে। বিপ্রগণ জানেন, রজ-সত্ত্ব-তমঃ এই ত্রিগুণ প্রবর্ত্তনা লইয়াই আর্য্য জাতির বৈদিকী ত্রিসন্ধ্যা বিরচিতা, বেদোক্ত প্রাতঃসন্ধ্যা সাবিত্রীরূপা কুমারী, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা বিষ্ণুশাক্ত যুবতী ও সায়ংসন্ধ্যা নিবৃত্তিরূপা বৃদ্ধা সতী মূর্ত্তি ভগবতী। সংক্ষেপে এই তিনটী ব্রহ্মের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী তিন শক্তি; বিপ্রগণ এর মধ্যে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এবং এই তিনের রস স্বরূপ যথাক্রমে আপ, জ্যোতিঃ ও অমৃত এই তিন ও এর সঙ্গে ব্রহ্মভূক্ত আরও কত কবিত্ব রস মিশাইয়া অতি

সুমিষ্ট ভাবে প্রাণায়াম যোগে একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন ব্রহ্ম ভাবনা করেন। যাহা হউক এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহাই জ্ঞাতব্য যে, আর্য্যজাতির নিকট এই নারীচিত্রগুলি কেমন উচ্চ ধারণায় সংরক্ষিত।

এর সঙ্গে আরও একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা আনিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশীয়েরা কেহ ঈশ্বরকে প্রভুভাবে ও কেহ পিতৃভাবে অর্থাৎ শুধু পুরুষাকারে ধারণ করিয়া নিয়াছেন; কিন্তু আর্য্যগণ উক্ত পুরুষাকার ভাব রক্ষা করিয়াও তৎসঙ্গে আবার অতি সুমিষ্ট মাতৃভাবের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য ঈশ্বরেতে এই মাতৃভাব পিতৃভাব কিংবা প্রভুভাবের আরোপ এক একটী অত্যাদরের উপমা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কোন্ জাতির নিকট উল্লিখিত কোন্ ভাবটী অধিকতর আদরণীয়; বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষীয় ভিন্ন নারীর মাতৃভাবের এমন সুমিষ্ট আদর ও সম্মান আর কোন জাতিই দেখান নাই। সুতরাং ভারতেই নারীজাতির বিশিষ্ট সমাদর ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয়েরা ঈশ্বরকে পিতৃভাবে ধারণ করিতে যাইয়াও তদনুগত মাতৃভাবটী একবারে ভুলিতে পারেন নাই; বাস্তবিক মাতৃভাব বিরহিত পিতৃত্ব এতদ্দেশীয়দিগের নিকট একটী অসম্পূর্ণ আরোপ বলিয়াই প্রতীত। আর্য্য মনীষীদিগের অভিমতে মানবীয় ভাবে যেমন স্ত্রী ও

পুরুষ এই দুয়েতে একটী পূর্ণ সৃষ্টি, তেমনি মূল প্রকৃতি ও চিন্ময় পরমাত্মাতে একটী ঐশী পূর্ণতা। বড় বড় জ্ঞানিগণ মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া দেখিয়াছেন, এই বিশ্ব প্রকৃতি পুরুষেরই লীলাভূমি; এই দুয়ের এমনি নিত্য যোগ যে, বিশ্বোৎপত্তি বিষয়ে ইহাদের একটীকেও পরিহার করা যায় না। এই জ্ঞানে মূলতঃ ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা বা পিতা হইলেও বাহ্যতঃ আমরা প্রকৃতির ভিতরেই পূর্ণাবয়বে গঠিত হইয়া আসিতেছি এবং তাহার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রকৃতির ক্রোড়েই নিয়ত লালিত পালিত, সুতরাং প্রকৃতিতে মাতৃত্ব ও ঈশ্বরে পিতৃত্বের আরোপ অতি সুন্দর ও অত্যন্ত সঙ্গত অভিনিবেশ বলিতে হইবে। তাহার পর দেখা যায়, শুধু এই জড় পরম বা প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াই ভারত সন্তান পরিতৃপ্ত নহেন, তাঁহারা প্রীতিভরে এই দুইকে একত্র মিশাইয়া নিত্য গন্ধ পুষ্পদ্বারা আদর করেন। দেশের পণ্ডিতবর্গ জানেন, পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য্য ও অহঙ্কার তত্ত্ব বা যজমানমূর্ত্তি এই আটটী শিবের অষ্টমূর্ত্তি, শিবপূজা করিবার সময়ে তৎসঙ্গে এই অষ্ট মূর্ত্তিকেও গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা বা আদর করা হয়। এতদ্দারা স্বরূপতঃ ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই সমস্ত বাহ্য জগৎ সেই ব্রহ্মভূত দেবদেবময় চিন্ময় পদার্থেরই মূর্ত্তি অর্থাৎ বহিরাবরণমাত্র আর তিনি (সেই শিব) এই অষ্ট শক্তির অন্তর্ভুক্ত পরমাত্মা। ফলে এই মূলতত্ত্ব ধরিয়াই ভগবানকে বিশ্বমূর্ত্তি বলা হয়।

বস্তুতঃ এই দেশে এই জড় পরমে মিশান ভাব এক অতি গূঢ় রহস্য, বৈষ্ণবগণ ঐ নিত্য সত্য পরব্রহ্মেরই হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার সহিত অষ্ট সখার সম্মিলন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে, তাঁহাদের তন্ময়তা, তাহাও স্বরূপ ভাবে প্রকৃতি পুরুষেরই লীলা প্রকটনমাত্র। এইখানে এই প্রকৃতি পুরুষের নিত্যযোগ বা সপ্রেম আশ্লিষ্ট ভাবটী যাহাদের বুদ্ধিগম্য হয় নাই, সেই অনভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী লোকেরাই ভারতবর্ষীয়দিগকে জড়োপাসক ও স্থূলদৃষ্টি বলিয়া নিত্য অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ মহানুভবদিগের জানা উচিত আর্য্য মনীষীদিগের লক্ষ্য পদার্থটী কি ও তাঁহারা কি ভাবে জড় পরমকে ধারণ করেন। যাহা হউক এই স্থানে এই সুদীর্ঘ ভাবনাতে ইহাই সর্ব্বোপরি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, এই সমস্ত অতি গভীর গবেষণার সঙ্গেও কেমন নারীভাবেরই সৌন্দর্য্য ও মিষ্টতা পরতে পরতে মাখান রহিয়াছে।

অতঃপর ব্রহ্মকে তান্ত্রিকী ধারণায় ব্রহ্মময়ীরূপে ধারণ করিতে যাইয়াও আর্য্যগণ নারীজাতির উপর সেই জগন্মাতার যে একটু ছায়াপাত করিয়াছেন, তাঁহা আরও সুন্দর। মার্কণ্ডেয় পুরাণীয় দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর একস্থানে বিশ্ব-জননীকে লক্ষ্য করিয়াই তদীয় গুণ বর্ণন করিতে করিতে বলা হইয়াছে, "হে দেবি! বিশ্ব মধ্যে সমস্ত স্ত্রী তোমার অংশ ভূতা, জননীরূপে একা তুমিই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া

রহিয়াছ।"* অর্থাৎ তোমারই মাতৃভাব জগতে পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ স্ত্রী মাত্রেরই অযত্ন লব্ধ সুধাময় স্তন্য ও সন্তান পালনের ব্যবস্থাটুকু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহা যে সেই বিশ্ব-মাতারই বাৎসল্য লীলা ইহা স্বীকার না করিয়াই পারা যায় না। বাস্তবিক বিশ্বজননীর এই অত্যাশ্চর্য্য বাৎসল্য ভাবে আধুনিক ভক্তবৃন্দকেও আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহারাও অতি মধুর মাতৃভাবে ঈশ্বরকে ধারণ করিয়া অত্যন্ত পুলকের সহিত গাইয়া থাকেন।

"সংসার মন্দিরে প্রতি পরিবারে করিছ বিহার ওগো মা জননি।
পরম যতনে পুত্র কন্যাগণে পালিছ আদরে দিবস রজনী॥"

তবেই এইক্ষণে সকলের জানিয়া রাখা উচিত, এতদ্দেশে নারীগণ কোন সময়েই অনাদৃতা নহেন। কি আধুনিক কি প্রাচীন সকলের নিকট তাঁহারা অত্যন্ত উচ্চ মহিমায় বিধৃতা হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ভারতে নারীজন্ম বা নারীজীবন তুচ্ছনীয় নহে।

যাহা হউক ঐ ভগ্ন পরিবারের মধ্যে ভর্ত্তৃশোকাতুরা মাতার অশ্রুজলে সিক্তা হইয়া থাকিলেও, আমাদের এই উল্লিখিত কন্যা সন্তানটীই, তাঁহার সেই স্বর্গীয় পিতার সৎ-

* "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ॥"

টীকা—দেবি! জগৎসু সমস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ তব সকলাঃ (অংশভূতাঃ) অম্বয় (জননীরূপয়া) একয়া ত্বয়া জগৎ পূরিতং (ব্যাপ্তং)

কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া পিতৃকুলে স্থান পরিগ্রহ করেন। এবং মাতা দিনময়ী দেবী যথাকালে আগ সমাদরে একজন অতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত দ্বারা তাঁহার জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। জ্যোতিষীয় নির্দ্দেশ মতে বামাসুন্দরীর জন্ম নক্ষত্রের ফল এই—"তিনি পরাক্রান্তা, দানশীলা, ভূসম্পত্তির অধিশ্বরী, কার্য্যদক্ষ ও কিঞ্চিৎ কোপাক্রান্তা বা তেজস্বিনী হইবেন। আর শিরাল অর্থাৎ ইঁহার একটী রক্ত স্রাবিনী শিরা প্রবলা থাকিবে।" বাস্তবিক এই গুণ দোষ সমস্তই অতি খাটিরূপে ইঁহার জীবনে বিদ্যমান ছিল। কোষ্ঠী গণনা অবশ্য অনেকেই বিশ্বাস করেন না ইহা আমরা জানি, কিন্তু বামাসুন্দরীর জীবনে তাঁহার কোষ্ঠী লিখিত প্রায় সমস্ত কথাই ফলিত হইতে দেখা গেল। ১৪,২১ ও ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি কঠিন রোগাক্রান্ত হইবেন ইহা লিখিত ছিল, তাহা বাস্তবিক অতি খাঁটিরূপেই যথাযথ সময়ে ঘটিয়াছে। অবশ্য এই স্থানে বামাসুন্দরীর জন্মনক্ষত্র ঘটিত যে কয়েকটী গুণ দোষের কথা উল্লেখিত হইল, তন্মধ্যে তিনি যে দানশীলা ছিলেন, এই কথাটী আমরা বলিতে পারি না কিন্তু এই বিষয়েও অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, গরিব দুঃখীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, এবং দান করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও তজ্জন্য সততই তাঁহার একটা উন্মুখতা ছিল।

কুমারী বামাসুন্দরী মায়ের একটীমাত্র সন্তান বলিয়াই হউক বা অতি সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা বলিয়া মাতুলালয়ে ইহার অত্যন্ত সমাদর ছিল। অবশ্যই ইনি যে খুব এক সুন্দরী বা গুণবতী ছিলেন তাহা নহে। কিন্তু বালিকা সময় হইতেই ইহার মধ্যে এমন একটী প্রকৃতি মধুর কমনীয় গুণ ছিল যে, তাহাতে তাঁহাকে সকলের ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। ফলতঃ ইহা তাঁহার অত্যন্তই এক সৌভাগ্য যে, শিশুকাল হইতেই ইনি ইষ্টমিত্র সকলের কাছে আদরণীয়া ছিলেন।

বামাসুন্দরী যেসময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন দেশে বিশেষতঃ পাড়া গাঁয়ে স্ত্রীলোকের সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শিক্ষার কোনও প্রবর্ত্তনা ছিল না, কিন্তু তাহা না হইলেও আসল জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া যে শিক্ষা বা ভাবী জীবনের প্রবর্ত্তনা, তাহা ক্রীড়াচ্ছলে ও বালিকোচিত ব্রতচর্য্যায় বিলক্ষণ রূপেই শিক্ষা দেওয়া হইত। অবশ্য অধুনা ব্রত বলিলেই অনেকে হয়তো একটা কুসংস্কার কিম্বা নিতান্ত একটা অবোধের কাণ্ডকারখানা মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের এক মহা ভুল। ব্রত মাত্রেরই উদ্দেশ্য কোন একটী সদ্ভাবে জীবন পরিচালনা। এই উনবিংশ শতাব্দীর মহা সভ্যতার যুগেও দেখা গেল, সংস্কার প্রিয় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র এতদ্দেশে নারীজাতির অসংখ্য ব্রত বিধান সত্ত্বেও আরো দুই একটী অভিনব ব্রতের প্রবর্ত্তনা দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। ৭

যাহা হউক আমাদের এই অত্যাদরের দ্বিজ বালিকার মুখে গেয় তাঁহার মাঘমণ্ডল ব্রতের একটী সুন্দর গাথা লেখকের মনে এখনও অঙ্কিত আছে। সেই মেয়েলী কবিত্বপূর্ণ গ্রাম্যগেয় গাথা বা বাল্যব্রতের মন্ত্রটী এই—

"মাঘ মণ্ডল সোণারকুণ্ডল,
বাপ রাজা ভাই প্রজা,
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী,
দুধভাত ভৃঙ্গার পাণি,
জন্মে জন্মে এয়োরাণী।"

এই ব্রতের অন্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক কিন্তু ঐ সুকুমার বাল্য জীবন হইতে বাবাকে রাজা এবং মাকে পাটেশ্বরী বলিয়া যে একটী ধারণা তাহা বড়ই সুন্দর ও অত্যন্ত সুমিষ্ট। আর ভাই প্রজা এইটীও বড়ই এক সুন্দর ও সঙ্গত অভিনিবেশ; তাহার উপর "আপনি বিদ্যাধরী" এই কথাটা আরও মিষ্ট; প্রকৃত পক্ষে আত্মাদরের যদি কোন মাহাত্ম্য বা সৌন্দর্য্য থাকে, তবে এই নিরভিমান সরল বালিকোক্তিতেই তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হইবার কথা। আর চতুর্থ অভিনিবেশ "দুধভাত ভৃঙ্গারপাণি" এইটী আড়ম্বর শূন্য এক অতি সুখাবস্থার কল্পনা। তাহার পর ব্রতধারিণী বালিকার সর্ব্বশেষ আকাঙ্ক্ষা সধবা থাকিয়া সৌভাগ্যপ্রাপ্তি। এইটী নারী মাত্রেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষণীয়।

এই ব্রতে সমস্ত মাঘমাস ব্যাপিয়া ব্রতধারিণী বালিকার প্রাতঃস্নান করিবার বিধি। তৎপর সেই কৃতস্নানা কুমারী সাদরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়া নির্দ্দিষ্ট বেদীর উপর চন্দ্রসূর্য্যাদি অঙ্কন পূর্ব্বক দূর্ব্বা তুলসীহস্তে পূর্ব্ববৎ সরল বচনে এক একটীকে পূজা ও আদর করিয়া থাকেন। বস্তুতঃই ঈশ্বরের রাজ্যে চন্দ্রসূর্য্য এই দুইটী অতি আদরের জিনিষ। ইহার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রত প্রতিষ্ঠার দিবস সত্য সত্যই সেই বালিকাকে বিদ্যাধরীর মত সুসজ্জিত করিয়া একটী উচ্চাসনে বসান হয়; এই সময়ে একজন পরিচারক বা পরিচারিকা এই বালিকার উপরে ছত্রধারণ করিয়া থাকে। এবং সমবেত পুরস্ত্রীবর্গ উলুধ্বনি করিয়া হাস্য পরিহাসের সহিত যথাযোগ্য সঙ্গীত করেন। এবং সেই বিদ্যাধরীর উপর পুষ্পবর্ষণের অনুকৃতিতে ফল সন্দেশ সমেত লাজাবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া থাকেন। আর তখন মাতাদি গুরুজনদিগের অভিপ্রায় এবং নির্ব্বাচন মতে অন্য একটী সমবয়স্কা প্রণয়িণী বালিকা আসিয়া একটী কৃত্রিম পুষ্করিণী অর্থাৎ খাত হইতে ইঁহাকে উদ্ধার করেন। এবং ইঁহার সহিত সখীত্ব স্থাপন করিয়া উভয়ে সুমধুর সখীভাবে সম্মিলিতা হয়েন। এই দিবস এই উপলক্ষে ইষ্ট মিত্র সকলকেই অত্যাদরে ভোজন করাইবার প্রথা আছে। বস্তুত বালিকা-দিগের পক্ষে ইহা খুব এক আমোদ জনক ব্রত। অথচ ইহার সঙ্গে সঙ্গে অতি সুন্দর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালনা ও বিবিধ

ভাবের শিক্ষা আছে। এই ব্রতোপলক্ষের বামাসুন্দরীর একটী প্রণয়িনী সখী এখনও বিদ্যমানা আছেন।

এতদ্ভিন্ন আর্য্যনারীদিগের ষষ্ঠী কর্ম্মপুরুষ ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রভৃতি ও নারীর কোমল স্নেহ প্রবৃত্তি হইতে উত্থিত এক একটী অতি সুন্দর সাময়িক অনুষ্ঠান।

ষষ্ঠীতে মাতৃগণ জামাতা এবং কন্যাপুত্রদিগকে প্রীতিপূর্ণ মনে সস্নেহ আশীর্ব্বাদ দিয়া আপ্যায়িত করেন। ভারতের মাতা সকল এই ব্রতব্যপদেশে মূলতঃ বিশ্বমাতারই পূজা করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ফল পুষ্প দূর্ব্বাঙ্কত হস্তে স্ব স্ব স্নেহাস্পদদিগের শিরে শান্তিবারি সিঞ্চন পূর্ব্বক স্নেহ ভরে সুমিষ্ট ভোজের সহিত ধান্যদূর্ব্বা এবং নববস্ত্র দিয়া তাঁহাদিগকে আদর করেন। ফলতঃ বর্ষে বর্ষে এইরূপ মাতৃস্নেহ নবীভূত করিয়া সন্তানদিগকে আস্বাদন করিতে দেওয়া নারীজীবনের একটী অতি উৎকৃষ্ট প্রবর্ত্তনা। শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ বা আদৃত করিবার প্রথাটীও ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহারও ভিতরে একটু কবিত্ব, একটু পাণ্ডিত্য ও অতি সুমিষ্ট ভাবুকতা আছে. যে জন্য এই দুইটী বস্তু শিরে ধারণ করিয়া সেই আশীর্ব্বাদিকা দেবী সকলকে পায়ে পড়িয়া ভক্তি দিতে স্বতঃই একটা প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। সকলই জানেন, দূর্ব্বার একটু শিকড় কেমন অক্ষয় বীজ। আর একটা ধান্য হইতে কেমন শত শত ধান্য উৎপন্ন হইয়া

থাকে ; আশীর্ব্বাদকালে সেই স্নেহাস্পদদিগের ও অক্ষয় জীবন ও সন্ততি বৃদ্ধির কামানাটুকই তৎসঙ্গে নিহিত আছে ইহা মনে করিতে হইবে।

তাহার পর কর্ম্মপুরুষ ব্রতে জগদ্‌বন্ধু বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই স্ব স্ব অভিমত এক একটী প্রণয়ী লোকের সহিত কেহবা নূতনকল্পে কেহ বা পুরাতন বন্ধুর সহিতই প্রেম ব্যবহার করিয়া পরস্পরের প্রেম প্রতি বর্ষে নব নব ভাবে উদ্রিক্ত করিয়া থাকেন। পুরুষদিগের মধ্যে আবার যাঁহারা সাত্বিক লোক তাঁহারা মানুষের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করিয়া যিনি বিশ্বজনের বন্ধু ও সর্ব্বোপরি প্রেমবান্, সেই বিশ্বের আপ্যায়িতা বিষ্ণুর সহিত বন্ধুত্ব বিধান্ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাব চরিতার্থ করেন। এইরূপ নারীগণের মধ্যেও অনেকে মনের মত মানুষ না পাইলে বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর সহিত সখীত্ব স্থাপন করিয়া আপনাদের সখ্যভাব চরিতার্থ করেন। এই ব্রতের আর একটী উত্তমতা এই মধুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী দেবীয়া লক্ষেশ্বরী হইলেও পরস্পর সাতু বিনিময় করিয়া এই সুমধুর প্রেমসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন। ইহারও আদর্শ মূলগত ভাব এই অকৃত্রিম প্রণয় সাধনাতে আঢ্যতা প্রদর্শন আবশ্যকীয় নহে। আসল ভিতরে প্রেম থাকিলে সকলই মিষ্ট বোধ হইয়া থাকে, বিদুরের একমুষ্টি সাতু মুখে দিয়াই ত শ্রীকৃষ্ণ পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। যাহা হউক বলিতে হইবে, ইহা নরনারীর

একটী অতি উৎকৃষ্ট প্রেমব্রত। নিশ্চয়ই আর্য্যসন্তান এতদ্দ্বারা সমাজে প্রেম বিস্তার করিয়া থাকেন। এই ব্রতে ও রামাসুন্দরীর একজন সখী ছিলেন, তাঁহারা এই ব্রতানুষ্ঠানকালে যখন যখন একত্রিত হইতেন, তত্তৎসময়ে ঐ সাতু ও তৎসঙ্গে ফল সন্দেশ বিনিময় করিয়া অপারআনন্দ লাভ করিতেন।

এইরূপ সাবিত্রীব্রত আর্য্যনারীদিগের আর একটী অতি সুমধুর প্রেমব্রত। এই ব্রতে সতীকুল অগ্রে ভারতের আদর্শসতী সাবিত্রীও সতী. পতি সত্যবানের পূজা করিয়া স্ব স্ব প্রেমাস্পদ পতিকে সাদরে মণ্ডলোপরি উপবেশন করাইয়া থাকেন, তৎপর তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দেন। এবং অতি সমাদরে মাথার কেশ দ্বারা পা দুইখানা মুছাইয়া পতির দেবত্ব আপনার মধ্যে ব্যবস্থাপিত করেন।. অহো, কি অপূর্ব্ব প্রেমব্রত! ফলতঃ এমন করিয়া স্বামীকে আদর করিতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত শুধু মুখের বচন বা কাব্যনাটকাদির উল্লেখ্য উপকথা নহে; ইহা জীবন্ত এক একটী ভাবের উপর আর্য্যনারীর কোমল চিত্তবৃত্তির এক এক প্রকার পরিচালনা। বাস্তবিক বলিতে গেলে এতদ্দেশে এই জীবনগত শিক্ষাই বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিরূপে সন্তানদিগকে বাৎসল্য দিয়া পরিতুষ্ট করিতে হয় ও কিরূপে পরকে ও আপনার সখীরূপে ধারণ করিয়া প্রেম

করিতে হয় এবং স্বীয় জীবন সহচরকে কিরূপে আদর করিতে হয়, তাহা বাক্যে না বলিয়া এইরূপ জীবন দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখান অবশ্যই খুব বেশী ফলপ্রদ মনে করিতে হইবে।

এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিধবাদেবীগণ কম্নদাহ, অম্বুবাচী প্রভৃতি অতি উন্নত যতি ব্রত করিয়া বর্ষে বর্ষে সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের মধ্যে তিন দিবস কম্নদাহ ব্রত, এই ব্রতে যতি ব্রহ্মচারী ও বিধবা তিনেরই অগ্নি স্পর্শ নিষেধ, এই তিন দিবস তাঁহারা স্বপাক ভোজন করেন না; যদৃচ্ছা ক্রমে যাহা লব্ধ হয়, তাহাই ভোজন করিয়া থাকেন। আর অম্বুবাচীতে স্বপাক পর-পাক দুইই নিষিদ্ধ। এই তিন দিবস আতপ দুগ্ধ ও ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিধি। কিন্তু বাল-বিধবা অথবা রুগ্ন ভগ্না হইলে এত কঠোর আচরণ না করিলেও ব্রতভঙ্গ হয় না। এই ভিন্ন দৈহিক শুচিত্ববিধান, দ্রব্য-শুদ্ধি, গৃহশুদ্ধি ও পাকাদির বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতেও আর্য্যনারীগণ সততই উদ্যুক্ত ও নিত্য অভ্যস্তা। তাহাও স্বেচ্ছাচার ভাবে নয়, ভারতীয় বিচক্ষণ বহুদর্শী ঋষিবর্গের শাস্ত্রীয় পরামর্শ অনুসারেই নিয়ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কি সুন্দর নিয়ম, সমস্ত ভারত একই ধর্ম্মসংহিতা দ্বারা সতত অনুপ্রাণিত।

এতদ্ভিন্ন লৌকিক শিষ্টাচার বা বিনয় ভদ্রতা বিষয়েও

যে আর্য্যনারী অশিক্ষিতা এমন বোধ হয় না। তাঁহারা নবাগত ক্রোড়স্থ শিশুদিগের শির আঘ্রাণ করিয়া আদৃত করেন। অপর কিঞ্চিৎ বয়স্থ প্রণত বালকবালিকাদিগের শিরও সর্ব্বাঙ্গ নিছিয়া পুছিয়া আহ্লাদ করেন। এবং সমাগত নমস্ত গুরুজনদিগকে পায়ে পড়িয়া অভিবাদন ও অতি কোমল হস্তে পায়ের ধূলা শিরে মাথাইয়া উন্নত শিষ্টাচার রক্ষা করেন।

আর তাঁহাদের বস্ত্র পরিধানের প্রথা অতি প্রশংসনীয়। এক বস্ত্রেই তাঁহাদের উত্তরায় এবং পরিধেয়ের কার্য্য সাধিত হয় এবং আপাদ মস্তক আবৃত হইয়া থাকে। অথচ স্বতন্ত্র অঙ্গাচ্ছাদন গড়াইয়া, ব্যয় বৃদ্ধি করিবারও কোন দরকার হয় না। অপর স্বর্ণাদি অলঙ্কার ধারণেও বেশ একটু বুদ্ধিমত্তা ও বৈজ্ঞানিকতা প্রকাশ পায়। কর্ণে দোদুল্যমান কুণ্ডল ও নাসিকা এবং আস্যে সোণার নোলক ধারণ করাতে মুখ ও নাসিকার উষ্ণ বায়ুতে সুবর্ণের শক্তি পরিগৃহীত হয়। সুতরাং ইহাতে আয়ু বৃদ্ধি হইবারই কথা আর অলঙ্কার দ্বারা অনায়াসে অবিসম্বাদিতরূপে একটী স্ত্রীধন রক্ষিত হয়। সকলেই জানেন, এই ধনের সম্বিভাগ নাই।

আর এক কথা এই, ইহার জন্যে কাহারও কোনরূপ যত্ন বা আয়াস করিতে হয় না। আর্য্য কন্যারা দেখিতে দেখিতেই নিতান্ত স্বাধীনভাবে জীবনের সমস্ত ভার আয়ত্ত করিয়া নিয়া থাকেন।

অবশ্য এইক্ষণকার প্রচলিত শিক্ষাতে ভাষার পারিপাট্য এবং নানা বিষয়িনী বুদ্ধি অল্লায়াসেই পাওয়া যায়, এই কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আবার ইহাও বহুদর্শী প্রাজ্ঞ লোকদিগের একটী বিবেচ্য কথা যে, বিশুদ্ধ ভাষা বা বুদ্ধি আর জীবনের কার্য্য এক নহে। একজন নানা ভাষায় সুপণ্ডিত কিংবা বুদ্ধিমান হইতে পারেন, কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, কার্য্যগত শিক্ষার অভাবে অতি সামান্য কার্য্য করিতেও তাহার উৎপাত বোধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লোক মাত্রেরই লেখা পড়া শিক্ষা এবং কর্ম্ম শিক্ষা দুইই অত্যন্ত আবশ্যকীয়। তথাপি অধুনা অনেক বহুদর্শী সুবিজ্ঞ লোকের অভিমত এই কেবল লেখা পড়া শিক্ষা হইতে বরং কেবল কর্ম্ম শিক্ষাই সংসারের পক্ষে সমধিক কল্যাণদায়িনী। তাঁহাদের মতে গৃহকর্ত্রী কেবলই সভ্যাভব্যা ও সর্ব্বশুক্লা বাগ্‌দেবী না হইয়া কর্ম্মকুশলা গৃহলক্ষ্মী হইলেই গৃহস্থের পক্ষে কল্যাণ। বস্তুতঃ কর্ম্মের জন্যই বিদ্যা ও বুদ্ধির আবশ্যক; চিনি সন্দেশ বা অন্ন ব্যঞ্জনের শুধু তত্ত্ব জানিলেই কাহারও ক্ষুন্নিবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি হয় না, তদর্থ অন্নাদি প্রস্তুত করাই একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা কর্ম্ম করিবারই প্রণালী বা উপযোগিতা শিখাইয়া দেয়মাত্র, সুতরাং লৌকিক কিংবা পারমার্থিক কর্ম্মহীন বিদ্যার অস্তিত্বে কোনও প্রয়োজন নাই, ইহাই কর্ম্মযোগের অকাট্য ব্যবস্থা বলিতে হইবে। তবে অবশ্য

কর্ম্মেতেও কি আদর্শে নারীজাতির জীবন প্রবর্ত্তনা আবশ্যক, এতদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবন প্রবর্ত্তনার উপরে দৃষ্টি স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অধুনা অনেক শিক্ষিতা রমণীই আদৌ পরিবারিক প্রবর্ত্তনাতে আবদ্ধা না হইয়া চিরকুমারী রূপে কেহ সেবাব্রত, কেহ বিদ্যা প্রচার ও কেহবা ধর্ম্মপ্রচারব্রত নিয়া জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্তা। অবশ্য জগতের পক্ষে এই সমস্ত একান্তই মাঙ্গলিক ক্রিয়া, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপে চির-কুমারা থাকিয়া নারীর সুমিষ্ট ভার্য্যাভাব ও মাতৃভাব উপেক্ষা করা নারীজাতির আদর্শ রীতি হইতে পারে কিনা তাহা সুধীগণের চিন্তনীয়। ঈশ্বরের সৃষ্টির মূলে দৃষ্টি রাখিয়া সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গার্হস্থ্য রীতিতে নরনারীর সম্মিলিত জীবন প্রবর্ত্তনাই ঈশ্বরের অভিমত ও সমাজের পক্ষেও একান্ত শ্রেয়স্কর। তথাপি যদি কেহ সেই সম্মিলিত জীবনকে কেবলই নিজের ভোগায়তন-ক্ষেত্র মনে করিয়া তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন অথবা ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াই কোন দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন, তদ্বিষয়ে আমরা কোনও প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহাকে এই মাত্রই বলিব যে, ইহাতে সেই জীবনপ্রবর্ত্তয়িতা ঈশ্বরের একটী অতি সুখকল্যাণাকর আদেশ কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই আপনার নিকট অবহেলিত হইয়া রহিল, প্রকৃত পক্ষে এই স্থানে আপনি ঈশ্বরের একটী সাক্ষাৎ আদেশ লঙ্ঘন করিতে-

ছেন। আমি বলি, যদি ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতিগত করিয়া তাঁহার সমস্ত আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, আর জীবনের প্রত্যেক ভাগই তৎপ্রণোদিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তবে সর্ব্বত্রই আমিত্বের অভিনিবেশ না রাখিয়া বিশুদ্ধজ্ঞানে তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে দেওয়া উচিত। আমার মতে কেবলই প্রচার, কেবলই বক্তৃতা ও কেবলই বহির্মুখ না হইয়া প্রত্যেক লোকেরই অগ্রে আপনার মধ্যে খাটিভাবে ঈশ্বরের সমস্ত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইতে দিয়া সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য! প্রকৃতপক্ষে এই জীবনগত ধর্ম্ম ও জীবনে মিশাইয়া শিক্ষাই জগৎ এইক্ষণে চাহিতেছে। বাস্তবিক এই নিষ্কাম বিশুদ্ধ কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্টতম যোগ ও এই জীবনগত শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ঈশ্বরের এই পুণ্যময়ী কর্ম্মভূমিতে একটী আদর্শকন্যা বা একটী আদর্শ প্রেমিকা-ভার্য্যা অথবা জগতে আদর্শভূতা একটী দেবীমাতা যে শিক্ষা বা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া যান, সহস্র বচন বা সহস্র বক্তৃতাতে তাহার শতাংশের একাংশও সাধিত হয় কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক, আমাদের আর্য্যভাবাপন্না বামাসুন্দরী দেবী এই জীবনগত শিক্ষারই সমধিক পক্ষপাতিনী ছিলেন। সকলই জানেন, এতদ্দেশের নারীগণ বিবাহিতা হইয়া কেমন সসম্ভ্রমে শির অবগুণ্ঠিত করিয়া চক্ষুলজ্জা সমাচ্ছাদন পূর্ব্বক বাক্‌সংযমের সহিত প্রেমব্রত গ্রহণ করেন ও দৃঢ়তার সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই ব্রতে পতিই গুরু, পতিই সাধনার

ধন দেবতা। তাঁহারা প্রতিদিন স্নান করিয়া অথবা অমনিই রাত্রিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুচি পবিত্রা হইয়া রন্ধন করেন ও একাগ্রমনে পতি ও পতির পোষ্যবর্গ পিতা মাতা ভাই বন্ধু অতিথি এবং ভৃত্যাদি আশ্রিতদিগের সেবা করেন। এই স্থানে বুঝিতে হইবে, যে সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইয়ুরোপীয় মহিলাগণ বহির্মুখ হইয়া দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া যান, সেই উন্নত দেবব্রত ভারতবর্ষীয় মহিলারা ঘরে বসিয়াই সাধন করিয়া থাকেন। আবার এর সঙ্গে কেমন নিষ্ঠা রহিয়াছে। আর্য্যমহিলাদিগের সেবাব্রতের ব্যবস্থা এই প্রত্যেক গৃহস্থের আলয়ে গৃহকর্ত্রীর ভোজন হইয়া গেলে সেই ভুক্তাবশিষ্ট রন্ধন অযজ্ঞীয়, অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টবৎ পরিগণনীয়. তদ্দ্বারা কোনও অতিথি, অভ্যাগতের সেবা করা বিধেয় নহে। এর উপরে আরও দৃষ্ট হয়, প্রেমিকা ভার্য্যা আরও একটু নিষ্ঠাবতী হইলে পতির পাদোদক পর্য্যন্ত পান করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাহার পর যাঁহার সাধন বল ইহারও উপরে গিয়াছে এবং আত্মাতে শক্তি বাঁধিয়াছে, তিনি নির্ভয়ে পতির জীবনান্তে তদীয় জলন্ত-চিতায় প্রবেশ পূর্ব্বক সেই প্রেমাস্পদেরই সঙ্গিনী হইবার জন্য পরলোক পর্য্যন্ত অকুতোভয়ে ধাবিতা হয়েন। তুমি আমি এইক্ষণে যাহাই বলিনা কেন কিন্তু সাধ্বীনারীর পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের কথা নয় যে, তিনি সেই প্রেমাস্পদের জন্য অক্লেশে প্রাণাহুতি দিতে পারেন। ভুবনসুন্দরী

নুরজাহানের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সুবিখ্যাত মোগলসম্রাট সেনা প্রেরণ দ্বারা সের আফ্‌গানের বধসাধন পূর্ব্বক অনায়াসেই তৎপত্নী নুরজাহানকে গ্রহণ করিতে ও নির্লজ্জভাবে আপনার সাম্রাজ্ঞী করিতে পারিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহা নরকুলের পক্ষে এক অতি ঘৃণিত ইতিহাস ও চরিত্র কলঙ্কের পরাকাষ্ঠা বলিতে হইবে। কিন্তু ভারতসতী চিতোর-রাজপত্নী পদ্মিনী কেমন অক্লান্তভাবে রক্তবস্ত্র পরিধান ও রক্তমাল্য ধারণ করিয়া জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক দুরন্ত যবনরাজের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। অবশ্যই বলিব ইহা ভারতনারীর জাতীয় শিক্ষা ও জীবনগত সাধনার ফল।

সকলই জানেন, এতদ্দেশের একটী জাতীয় প্রবক্তনা এই "রণে ভীত যে ক্ষত্রিয়, শীতে ভীত যে বিপ্র আর অগ্নি-ভীতা যে নারী তাহারা স্বর্গে যাইতে পারেন না।" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় যদি নির্ভয়ে জীবন দিয়া রাজ্য রক্ষা না করেন, বিপ্র যদি প্রাতঃ স্নানাদি করিয়া শুচিস্থ এবং সদাচার রক্ষা না করেন এবং নারী যদি আবশ্যকমতে অগ্নি প্রবেশ করিয়া সতীত্বের পরাক্রম প্রদর্শন না করেন, তবে তাহারা অস্বর্গীয়; নিশ্চয়ই স্বর্গভোগ প্রত্যাশা করিতে পারেন না। আমি বলি কেবল নারী নয়, পুরুষের পক্ষেও যাহা দৃষ্ট হইতেছে, স্বর্গের প্রলোভনেই হউক অথবা স্বার্থান্ধ হইয়া পররাষ্ট্র হরণোদ্যমে উপজাত ভয়ানক আসুরিক অনুষ্ঠান যুদ্ধকার্য্যে

লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ দেওয়া যদি অসভ্য বর্ব্বরতা না হইয়া গৌরবের বিষয় হয়, তবে দেবদুর্লভ সতীত্ব রক্ষা বা উন্নত প্রেমপ্রবর্ত্তনায় অকৃত্রিমভাবে সতীর আত্মাহুতি কেনই যে গৌরবের বিষয় হইবে না তাহা সুধীগণের চিন্তনীয়।

যাহা হউক সেই উন্নতমনা, তেজস্বিনী উচ্চশ্রেণীর ভারতরমণীর কথা স্বতন্ত্র। অধুনা ভারতের সাধারণ গৃহ-লক্ষ্মীদিগের কর্ম্মময় জীবনের উপরে দৃষ্টি করা যাউক, রন্ধন তাঁহাদের জীবনের এক বিশেষ কার্য্য এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে তরকারীকুটন, মাছকাটা ও মসলাপেষণ ও অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই অভ্যাস থাকা নিতান্ত আবশ্যকীয়। এতদ্ভিন্ন মনে একটু অনুরাগ থাকিলে পাতকাটা পীড়িচিত্র, আল্পনা ও মাঙ্গলিক কার্য্যবিশেষে ধান্যদূর্ব্বা এবং পত্র পুষ্পযোগে উত্তম কারুকার্য্যবিশিষ্ট আশীর্ব্বাদ প্রস্তুত করা, নারিকেলের চিড়া জিরা ও ফুলকাটা নানা রকমের সন্দেশ করা ও উত্তম দধি ক্ষীর, পায়স পিষ্টক, মাংস পলান্ন রন্ধন এই সমস্তই দেখিতে দেখিতে ও করিতে করিতে ভারতের গৃহলক্ষ্মীদিগকে শিক্ষা করিতে হয়। এর উপরেও সদ্বংশজাত কুলনারীগণকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সন্ধ্যা পূজা ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্রতচর্য্যা করিয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাবুদ্ধি ও সদ্‌জ্ঞানের সহিত নারীগণের উক্তরূপ জীবন প্রবর্ত্তনা থাকিলেই সর্ব্বাংশে উত্তম হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন বহুদর্শী প্রাজ্ঞ লোকের অভিমত এই

নারীজীবনে একটু বেশীপরিমাণে বিদ্যার প্রবর্ত্তনা দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আর কার্য্যকুশলা গৃহিণীরূপে স্বজনবর্গের সেবা পরিচর্য্যায় পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের মতে এইটুকুই লক্ষ্মী-সরস্বতীতে প্রভেদ। বস্তুতঃ এই ইঙ্গিতটীর উপর শিক্ষিতাদিগের একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক ইহা নিতান্তই এক সুখের বিষয় যে, আমাদের ঐ পিতৃহীনা ও সতত মাতার স্নেহপক্ষে সমাচ্ছাদিতা 'বামাসুন্দরীর জীবন কর্ম্মেতেই সুশোভিত। তিনি তৎকালোচিত গ্রাম্যরীতিতেই গৃহচর্য্যা ও কুলোচিত সদাচার এবং বালিকোচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে ধর্ম্মাচার দেখিতে দেখিতে এবং শিখিতে শিখিতে দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া মাতার অভিমত একটী টোলের ছাত্রের নিকট অত্যাদরে সমর্পিতা হয়েন।

আর্য্যনারী বামাসুন্দরী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বিবাহ নরনারীর এক অত্যুন্নত নৈতিক বিধান। শুধু উহারই পুণ্য পরিণাম গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় সুখসম্ভোগ; সজ্জন মাত্রেই অবগত আছেন, এই দ্বন্দ্বীভূত পবিত্র জীবনেই ধর্ম্মঅর্থকাম এই ত্রিবর্গ সাধিত হয়। আর দেবীরাও জানেন তাঁহারা এই বৈবাহিক জীবনেরই সদ্ব্যবহার করিয়া জগতে ধন্যা ও সাধ্বী সতী বলিয়া সম্মানিতা। আর তাঁহাদের ঐ যে সুকোমল মাতৃভাব তাহাও প্রকৃত পক্ষে বৈধবিবাহেরই এক অতি সুমিষ্ট উত্তরফল। কিন্তু বিচক্ষণ ঐতিহাসিক রসজ্ঞ পণ্ডিতকুল জানেন, ঈশ্বরের সৃষ্ট এই প্রাণিজগৎ মধ্যে সস্ত্রীক মনু বা আদম অথবা যে কোন নরমিথুন সর্ব্বাদৌভূলোকে উপস্থিত হইয়া থাকুন, সেই আদি ভূত পিতামাতা হইতে নরনারী কেবলই সোজাসোজি আসিয়া এই বর্ত্তমান সুসভ্য দাম্পত্যবিধানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বাস্তবিক কত

কষ্ট কত মনস্তাপ ও দাম্পত্য বিধানের কত পরিবর্ত্তনের পর পারবত্তন করিতে করিতেই এইখানে আসিতে পারিয়াছেন। এত যে হইয়াছে, তথাপি সার্ব্বজনিকভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্বর্গীয় জীবনপ্রবর্ত্তনার খুব খাঁটি একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিধান যেন এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যদিও সর্ব্বদেশীয় বিধানকর্ত্তারা স্ব স্ব রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে বিবাহপ্রথায় পুনঃ পুনঃ সংস্কার করিতে করিতে এই বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়া পঁহুছাইয়াছেন, তথাপি দেখা যায়, নরনারীর মনঃক্ষোভ বা অন্তরের লুকান বিষাদ যেন এখনও যায় নাই; কোথাও বাল্যবিবাহে আপত্তি, কোথাও অধিবেদনে দোষারোপ, কোথাও বৈধব্যপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ঐকান্তিক যত্ন, এর উপরেও আবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ স্ত্রীর স্বামী পরিত্যাগ ও স্বামীর স্ত্রী পরিত্যাগ, এই সমস্ত বক্ষ বিবাহ প্রথার মধ্যে রহিয়াছে। কে বলিবে, এই অসংখ্য বিভিন্ন-রুচির লোকের মধ্যে ইহা সর্ব্বথা নিরাপত্য হইয়া কখন পৃথিবীতে ব্যবস্থাপিত হইবে।

যাহা হউক বিবাহ যে নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে হওয়া উচিত নয় ইহা সর্ব্বদেশীয় সভ্য লোকদিগেরই প্রচলিত ব্যবস্থা। এর মধ্যেও মনস্বী আর্য্যজাতি এই বিষয়ে আরও একটু বেশী অগ্রসর ও বিশেষ সতর্ক; তাঁহারা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে পিতৃকুল হইতে সাত পুরুষ ও মাতামহ কুল হইতে পাঁচ পুরুষ বর্জ্জন করিয়া থাকেন। তাহার পর পিতৃ-বন্ধু

মাতৃ-বন্ধ অর্থাৎ পিতার পিসী ও মাসী ও মাতুলের সন্ততি এবং মাতার পিসী মাসী ও মাতুলের সন্ততি সম্যক পরিবর্জনায়। এই বিধানটী ভ্রমবশতঃ ও যদি কেহ উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলেও তাহাকে বিটলা বলিয়া সমাজে কত ঘৃণিত ও নিন্দনীয় হইতে হয়। আর কিছু না হউক এই সমস্ত বিচার দ্বারা এই ফল হয় যে, এক সম্পর্কের মধ্যে অন্য সম্পর্ক পাতিয়া পূর্ব্ব সম্পর্কের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে হয় না। আর এক কথা এই যে, নিঃসম্পর্কিত লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই রক্তমাংসের প্রবর্ত্তনা বিষয়েও একটু অভিনবত্ব ঘটে। অনেকেরই শরীর গত এবং মনোগত এমন অনেক দোষ বা গুণ আছে, যাহা বংশপরম্পরাগত হইয়া সংক্রামিত হয়; সুতরাং বিভিন্ন রক্ত সংমিশ্রণে তদ্বিষয়েও কথঞ্চিৎ উপকার অবশ্যই হইয়া থাকে; যে উপকারের প্রত্যাশায় শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্নবর্ণে বিবাহ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যকীয় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্কর-বিবাহে মনোবৃত্তির হানি ও স্বাস্থ্যতার বৈলক্ষণ্য হয় বলিয়া, ইহা আর্য্য মনীষীদিগের একান্ত অনভিমত মত।

তাহার পর বিবাহে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করাও আর একটী বিশেষ কার্য্য। এতদ্বিষয়ে সুসভ্য শিক্ষিত সমাজ যাহাই বলুন না কেন, সাধারণ গৃহস্থ লোকের পক্ষে পিত্রাদি গুরুজনদিগের হস্তেই এই নির্ব্বাচন ভারটী রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারে কন্যার পক্ষে, বরের চরিত্রই সর্ব্বাগ্র

দর্শনীয়। আর বরের পক্ষেও সুলক্ষণা কন্যা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, একটা সুলক্ষণা স্ত্রীরত্ন লাভ করা বড় অল্প ভাগ্যের কথা নয়; প্রাচীন মনীষীদিগের পরামর্শ এই দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবে।

তাহার পর ইহাও সজ্জনদিগের একটী স্মরণীয় বিষয় যে, নবনারীর এই স্বর্গীয় সম্বন্ধ সংস্থাপনে অর্থসংস্রব অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা পুত্রের বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত এক-হীনতা। আর্য্যদের ব্যবস্থামতে ইহা আসুরিক বিবাহ। মহর্ষি ভৃগু মনুসংহিতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন, অর্থ দ্বারা ক্রীত ভার্য্যা ভার্য্যাই নহে। বস্তুতঃ অনন্ত জীবন যাহার সুধাময় গন্ধ আঘ্রাণ করিতে হইবে, সেই জীবনসহচরীকে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া তাহার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা নিশ্চয়ই এক মহা অকল্যাণ ও অত্যন্ত অনার্য্যতা।

যাহা হউক ইহা নিতান্তই এক সুখের বার্ত্তা যে, আমাদের উল্লেখিতা দ্বিজকুমারী বামাসুন্দরী ঠিক আর্য্যভাবেই শুকল্পনাভিমত একটী বরে সমর্পিতা হইয়াছিলেন। যে বরের সহিত ইঁহার শুভসম্মিলন হয়, সেই দ্বিজকুমারও অতি অল্প বয়সেই মাতৃপিতৃ হীন হইয়া ঘরবাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট একক্রমে বার বৎসর অধ্যয়ন করেন। সংসারে ইঁহার কেহ না থাকায় অধ্যয়নই তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল; ইনি রাত্র্যংশে জাগিয়া প্রতি রোজ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ব্বাধীত

পাঠ অতি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ রাখিতে যত্ন করিতেন। তৎপর সূর্য্যোদয় সময়ে প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দন করিয়া পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক দৈনিক পাঠ অভ্যাস করিতেন। তাহার পর অধ্যাপক গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া নূতন পাঠ গ্রহণ করা হইত। এবং তদনন্তর যথাবিধি মধ্যাহ্নস্নান তর্পণ ও পূজা আহ্নিক করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রানুসারে ধারণা ছিল, জ্ঞান পাইতে হইলে শঙ্করের আরাধনা করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে প্রতিদিন নিষ্কাম ভাবে ও নিঃসঙ্কল্পে একটী নিত্য শিবপূজা করিয়া বিদ্যালাভের জন্য বিশেষ ভাবে আর একটী শিব পূজা করিতেন। এতদ্দ্বারা ইহাই এই স্থলে জ্ঞাতব্য যে, যাঁহার অন্তরে এরূপ এক বিদ্যানুরাগ ছিল ও যাঁহার সংসারে আর কেহই ছিল না, এমন একটী বর সমগ্র হৃদয় লইয়া এই ভাগ্যবতীর সঙ্গে আত্মসংমিশ্রণ করেন।

প্রথমতঃ ইঁহার পূজ্যপাদ অধ্যাপককালীকান্ত তর্কভূষণ মহাশয় ও রত্নাকর ভট্টাচার্য্য নামক যে এক অতি সম্ভ্রান্ত দ্বিজবরের আলয়ে থাকিয়া তিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং যে মহাত্মা ইহাঁকে সহোদর সম ভালবাসিতেন, সেই পরম হিতৈষী পূজ্যতম ব্যক্তিদ্বয় যাইয়া এক দিবস আমাদের এই পিতৃহীনা সুলক্ষণা বালিকার সহিত ইহাঁর সম্বন্ধের আলাপ করেন। তৎপর ঘটনাক্রমে এক দিবস পাত্রীর স্বসম্পর্কিত শ্যামানন্দ শিরোমণি নামক এক জন বহুদর্শী প্রাচীন পণ্ডিতের

সহিত ঐ শাস্ত্রোৎসাহী যুবকের সাক্ষাৎ হয়। তাহাতে অনেকক্ষণ শাস্ত্রালাপের পর ঐ পণ্ডিত প্রবর স্বয়ং জানিয়াও সংস্কৃত বাক্যে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কাহার নিকট পড়েন? যুবক সংস্কৃতেই উত্তর করিলেন, কালীকান্ত তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা হইল, কালীকান্ত অর্থ কি? যুবক বলিলেন, বিশ্ব অভিধান মতে কান্ত শব্দের অর্থ মনোরম, রুচা এবং মনোজ্ঞ, অতএব কালীকান্ত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিয়া ইহার অর্থ এই হইতে পারে, কালী সমীপে যিনি মনোজ্ঞ অর্থাৎ প্রিয়ভক্ত অথবা বহুব্রীহি সমাস করিয়া কালীকান্তা মনোজ্ঞা যাহার, অর্থাৎ কালী যাহার চিত্তানন্দ দায়িনী, সেই কালীভক্ত পুরুষ। এই দুইটী যুক্তিযুক্ত অভিনব ব্যাখ্যা শুনিয়া সেই পণ্ডিতবর আর কোন কথা না বলিয়াই অত্যন্ত সন্তুষ্টির সহিত চলিয়া যান। তাহার পরেই বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া বর কন্যার শুভসম্মিলন হয়।

এইরূপ শাস্ত্রালাপ দ্বারা বর মনোনীত করা এতদ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর চিরন্তনী প্রথা। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, অনেক সভ্য দেশে প্রাচীন সময়ে অস্ত্র শিক্ষা বা অস্ত্র-নৈপুণ্য দ্বারা পাত্র নির্ব্বাচন করা হইত। এতদ্দেশেও ধনুর্ভঙ্গ ও লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি বৈবাহিক রঙ্গ সকল অতিশয় প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ যাঁহারা রাজ্যেশ্বর ও রাজ্য রক্ষা করাই যাহাদের জীবনের কার্য্য, সেই রাজন্যবর্গের পক্ষে বর ধনুর্ব্বেদে নিষ্ঠিত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর পণ্ডিতকুলের পক্ষে

বর শাস্ত্রমল্ল বা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইয়া থাকে।

বামাসুন্দরীর পিতৃকুল ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সরিপপুর গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী বংশ। ইঁহারা মহ গোষ্ঠী এবং পুরুষানুক্রমে অতি সম্মানের সহিত তথায় অবস্থান করিয়া আসিতেছেন।

আর ভর্ত্তৃকুল ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাস্তুলের সিমলাই কাশ্যপ। কাস্তুলের সিমলাই কাশ্যপের দুইটী ধারা আছে, বামাসুন্দরীর ভর্ত্তৃকুল তাহারই অন্যতর ধারাতে অবস্থিত। কাস্তুলের এই উভয় ধারার কাশ্যপ আর শম্ভুপুরের গোস্বামী মহাশয়েরা একযোগে রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া কাস্তুলে অবস্থিতি করেন। এই গোস্বামী বংশ আর কাস্তুলের সিমলাই কাশ্যপ এই উভয় আবাহমানকাল পরস্পর পৌরহিত্য সম্বন্ধে নিবদ্ধ। স্ব স্ব খ্যাতি প্রতিপত্তি ভিন্ন ইহাও এই উভয় বংশের মৌলিকতার এক বিশেষ পরিচয়।

যাহা হউক বিবাহ হওয়া উভয় পক্ষের অভিমত হইলে শারদীয় পূর্ণিমার উত্তম জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ইঁহাদের শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাঙ্গালা ১২৬০ সালের কার্ত্তিক মাসে বামাসুন্দরীর জন্ম; তাহার পর ১২৭২ সালের কার্ত্তিক মাসে বার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তৎপর আবার ১৩০৫ সালের কার্ত্তিক মাসেই ৪৫ বৎসর বয়সে ইঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি হইল। তন্মধ্যে ইঁহার বৈবাহিক জীবন সম্পূর্ণ ৩৩

বৎসর। এই সময় মধ্যে ইনি নয়টী পুত্রকন্যা প্রসব করেন। এবং পতি সঙ্গিনী হইয়া অতি সম্মানে জীবন অতিবাহিত করিয়া যান।

যাহা হউক অতঃপর দেখা যাউক নরনারীর এই শুভ-সম্মিলনের জন্য কোথায় কিরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুসভ্য ইয়ুরোপীয়গণ সম্মানিত ধর্ম্ম যাজকের সঙ্গে পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরে যাইয়া এই সুমিষ্ট প্রীতিকর সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন। এবং ইহা সুদৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ করিবার জন্য রাজপুরুষদিগের নিকট লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখেন। এইরূপ মুসলমান বিধানেও যথা রীতিতে নমাজ করিয়া নরনারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, এবং সময়ে সময়ে বিবাহ বিভ্রাট উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারাও কাবিল পত্র দ্বারা পরস্পরকে যতদূর পারেন সুদৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ করেন। এইরূপে সভ্যজাতি মাত্রেই ধর্ম্ম বিধান ও প্রচলিত রাজ বিধানের সঙ্গে যোগ রাখিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

কিন্তু এতদ্বিষয়ে আর্য্যজাতির বিধান কিছু বিচিত্র, ইঁহাদের দলিলপত্র কিম্বা রাজবিধান কিছুরই আশ্রয় লইতে হয় না; শুধু বিধানের বলেই তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে চিরদিনের জন্য পরস্পরে সম্বদ্ধ হইয়া থাকেন। রামা-সুন্দরীর বিবাহে দুইজন পণ্ডিত দুই দিগে পৌরহিত্য করেন। এবং অতি বিশুদ্ধভাবে যাগযজ্ঞ ও মন্ত্রাদি পাঠ হয়। বিশেষতঃ রামাসুন্দরীর শাস্ত্রাধ্যায়ী স্বামীও নব

অনুরাগের সহিত অগ্রেই সমস্ত বিধিবিধান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির বিবাহ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। প্রথমতঃ উভয়পক্ষে গুরুপুরোহিত এবং ইষ্টমিত্র সকলকে যথা যোগ্য সমাদরে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আনিয়া সবান্ধবে মঙ্গলাচরণ সহ পূর্ব্বাহ্নে দেবার্চ্চনা ও স্বর্গবাসী নান্দীমুখ পিতৃলোকের পূজা। দেবতা স্থূল দৃষ্টিতে যদিও বহুতর বলিয়াই পরিলক্ষিত হউক কিন্তু স্বরূপতঃ একই ঈশ্বরকে বিবিধরূপে ধারণ করিয়া আর্য্যগণ তাঁহার পূজা করেন। এই উপক্রমে প্রথমতঃ সিদ্ধিদাতা গণেশ ও তৎপর ষোড়শ মাতৃকার পূজা হয়। এই মাতৃগণের মধ্যেও অগ্রে মোক্ষদায়িনী গৌরী ও তৎপশ্চাৎ সৌভাগ্য-দায়িনীলক্ষ্মী, স্বর্গাধীশ্বরী শচী, মেধারূপা সরস্বতী ও বেদমাতা সাবিত্রী প্রভৃতি ষোলকলাতে ব্রহ্মশক্তির অর্চনা হইয়া থাকে। তৎপর রজনীযোগে শুভলগ্নে বন্ধুবান্ধব এবং গ্রামবাসী নিমন্ত্রিত সর্ব্বজন সমক্ষে তিল তুলসী লইয়া সংকল্প পূর্ব্বক অভিমত বরে কন্যা সমর্পণ। তৃতীয়তঃ মুখচন্দ্রিকা অর্থাৎ শুভক্ষণে বরবধূর পরস্পর মুখাবলোকন। এই খানে বধূ সপ্ত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে করযোড়ে অভিবাদনপূর্ব্বক অতি সমাদরে সাতবার পতির উপরে যে পুষ্প বর্ষণ করেন, তাহা অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য এক ব্যাপার। তাহার পর বিবাহের চতুর্থ অঙ্গ হোম; ইহা সম্পূর্ণ একটী বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান। অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র সেই মহিমান্বিত দেব পুরোহিত

যজ্ঞ ভাগ নিয়া বায়ু বরুণ দিক্ আকাশ ও পৃথিব্যাদি অগ্নিমুখ দেবগণে উপস্থিত করেন। এতদ্দ্বারা সমস্ত প্রকৃতিই সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়া সেই উৎসবক্ষেত্রটাকে এক বিশুদ্ধ পুণ্য ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলে। সুতরাং ইহাতে বরবধূ উভয়েরই অন্তঃকরণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহারা বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ ধারণা লইয়া আত্মসম্মিলন করিতে পারেন। জীবতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতকুল জানেন, দেবপ্রসাদ বা প্রকৃতির প্রসন্নতা আমাদের কত আবশ্যকীয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রকৃতিপুরুষ অর্থাৎ জড় পরম এতদুভয়ের সন্তান হইলেও বাহ্যতঃ প্রকৃতির ক্রোড়েই সতত লালিত পালিত এবং আজীবন প্রকৃতি মাতারই অজস্রক্ষরিত সুধাময় স্তন্যপান করিয়া জীবিত। সুতরাং প্রকৃতির আরাধনা ও তাঁহার প্রসন্নতা বিধান আর্য্যঋষিদিগের মতে অত্যন্ত আবশ্যকীয়। ফলতঃ এই জন্যই আর্য্যসন্তান ঈশ্বরকে যেমন সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তারূপে ত্রিগুণ মহিমায় ধারণ করিয়া তাহাতে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, তেমনি প্রকৃতি মাতাকেও (অবশ্য অন্ধ বিশ্বাসে নয়) প্রত্যক্ষ ফলদ বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। ইহা অজ্ঞানের ক্রিয়া নয়, মূর্খতাও নয়।

যাহা হউক, এই অনুষ্ঠানে বস্ত্র পরিধাপনের পর বধূ অগ্নি সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকেন, আমার পতি আমার জন্য সেই পথ নির্দ্দেশ করুন, যদ্দ্বারা আমি সুখে

এবং নির্বিঘ্নে পতিলোকে প্রবেশ করিতে পারিব।" তৎপর বর বধূ উভয়ে যথাস্থানে উপবেশন করিলে পতি বধর অকল্যাণ নাশ ও সর্ব্বতোমুখী কল্যাণ উৎপাদন করিয়া দিবার জন্য অগ্রে ছয়টী ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। তাহার পর বধূও আবার পতির দীর্ঘায়ু এবং তদীয় জ্ঞাতি কুটম্বগণ ধনপুত্রাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হইবার কামনায় অঞ্জলি ভরিয়া সঘৃতলাজা অগ্নিতে আহুতি দেন।

ইহার পর বিবাহের পঞ্চম অঙ্গ সপ্তবেদী গমন। এই উপক্রমে পতি অতি মধুর বচনে বধূকে বলিয়া থাকেন। "বিষ্ণু অর্থাৎ বিশ্বের পালনকর্ত্তা ঈশ্বর অভীষ্ট পরিপূরণের জন্য তোমাকে একপদ অগ্রসর করুন। এবং বলোপচয় করিয়া দিবার জন্য বিষ্ণু তোমাকে আর এক পদ অগ্রসর করুন। আর যজ্ঞকার্য্যে অর্থাৎ অগ্নিহোত্র বেদাধ্যয়ন পিতৃ পূজা, অতিথিসৎকার ও ভূতবলি বা জীবসেবা রূপ পঞ্চ মহাযজ্ঞে সহায়তা করিবার জন্য বিষ্ণু তোমাকে আর এক পদ অগ্রসর করুন। এবং সর্ব্বপ্রকার সুখসাধনের জন্য বিষ্ণু তোমাকে আর এক পদ অগ্রসর করুন। তাহার পর গবাদি পশু পালনে সাহায্যের জন্য বিষ্ণু তোমাকে এক পদ অগ্রসর করুন। এবং ধন প্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য বিষ্ণু তোমাকে একপদ অগ্রসর করুন। তৎপর ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্যকারী ঋত্বিকদিগের সৎকার করিবার জন্য বিষ্ণু তোমাকে আর এক পদ অগ্রসর করুন।" ইহার পর পতি

আরও মিষ্টবচনে বলিয়া থাকেন, "হে কন্যকে! তুমি আমার সখা, অর্থাৎ সহচরী হও। এই সপ্তপদাক্রান্ত বিষয়ে আমিও তোমার সখা অর্থাৎ সহচর হইব। আর সৌভাগ্যবতী সুখকারিণী নারীগণ তোমার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করুন।"

বাস্তবিক এই উল্লিখিত সাতটী অভিপ্রায় মধ্যে গৃহস্থজীবনের প্রয়োজনায় প্রায় সমস্ত কথাই সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই সাতটীই বধূর পতিলোকে প্রবেশ করিবার পন্থা। এতদ্দারাই তিনি এক পদ এক পদ করিয়া অগ্রসর হইয়া পতির সহিত সম্মিলিতা হয়েন এবং উভয়ে সখ্যভাবে তাহাতে আজীবন বিচরণ করেন। অবশ্য সংস্কৃত মন্ত্রার্থানভিজ্ঞ লোকেরা মনে করেন, আর্য্যজাতির ক্রিয়াকাণ্ড সকলই পৌত্তলিকতাময় এবং ভাব বিবর্জ্জিত। কিন্তু একটু অভিনিবেশ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের সকলই জ্ঞান বিজ্ঞানে জড়িত ও অত্যন্ত ভাবপূর্ণ।

তাহার পর বিবাহের ষষ্ঠ অঙ্গ পাণিগ্রহণ। ইহাতে বর সাদরে বধূর করগ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন। "হে কন্যকে! সৌভাগ্যোৎপাদনের জন্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছি। জরা পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া গৃহের আধিপত্য করিবার জন্যেই তোমাকে দেবতারা আমায় প্রদান করিয়াছেন।"

"হে কন্যকে! তুমি সতত প্রসন্ন নয়নে দৃষ্টি করিবে। গবাদি পশুর কল্যাণ চিন্তা করিবে। আর প্রসন্নমনা অথচ

সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ দূর করিবার জন্য তুমি তেজঃ প্রদর্শন করিবে। এবং বীর ও জীবিত পুত্র প্রসব করিবে। আর পঞ্চ মহাযজ্ঞে নিয়ত রত এবং সুখোৎপাদনে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিবে।"

নিশ্চয়ই এই সমস্ত শুধু পাণ্ডিত্য কিংবা কবিত্ব নয়, ইহা সাদরে পরিগৃহীতা আর্য্যবধূর ভবিষ্যৎ জীবনের এক একটী মূলমন্ত্র। তাহার পর সেই জীবনসখা আরও প্রীতি-বচনে বলিয়া থাকেন, "হে কন্যকে! তুমি শ্বশুরের সন্নিধানে সাম্রাজ্ঞী অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখী আধিপত্য সহ প্রধানা গৃহকর্ত্রী হইয়া থাক। এবং এইরূপে শাশুরী এবং ননন্দ্ প্রভৃতি অন্যান্য পরিজন সকাশেও সাম্রাজ্ঞী হও।" আর "হে কন্যকে! আমার যাহা ব্রত অর্থাৎ সৎকার্য্যের সঙ্কল্প তাহা সিদ্ধি করিতে তুমি মনোযোগ দিবে। এবং আমার যাহা চিন্তা, তাহাতে তুমিও চিত্ত প্রদান করিবে। আর আমি যাহা বলি, তাহা তুমি একাগ্র মনে শুনিবে।'

তাহার পর উত্তর বিবাহ; এই খানে বধূ ধ্রুবনক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন, "হে ধ্রুবনক্ষত্র! তুমি ধ্রুব অর্থাৎ অত্যন্ত স্থির, কখনও স্থানচ্যুত হও না; তদ্রূপ আমিও পতিকুলে ধ্রুবা হইলাম।" এই খানে এই প্রতিজ্ঞা-বচনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুতা বালাবধূ আবার নিজের এবং পতির নামোল্লেখ করিয়া অতি পরিমিত বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, আমি অমুকা অমুকের হইলাম।

তৎপর আবার অরুন্ধতীকে দর্শন করিতে করিতে বধূ আরও গভীর অর্থযুক্ত বাক্যে প্রতিজ্ঞা করেন, "হে অরুন্ধতি! আমিও তোমার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পতিতে অবরুদ্ধা হইলাম।" অরুন্ধতী কর্দ্দম মুনির কন্যা এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের স্ত্রী; ইনি অত্যন্ত পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাতা। ফলে এই জন্যেই ইনি আর্য্যমহিলাগণের চির আদর্শ স্থানীয়া হইয়া রহিয়াছেন।

ইহার পর পতিও আবার বধূরদিগে দৃষ্টি করিয়া বলিয়া থাকেন, "যেমন দ্যুলোক ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য স্থিত, যেমন পৃথিবী স্থিরা, আর এই বিশ্ব যেমন নিত্য স্থায়ী এবং পর্ব্বত যেমন স্থির, সেইরূপ এই নারী পতিকুলে অচলা হউন।" প্রকৃত পক্ষে পতির এই অভিপ্রায়টী সুসিদ্ধ করেন বলিয়াই আর্য্যনারী অন্য জাতীয়া নারী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বস্তুতই ভারতসতী পতিকুলে অচলা।

এই সদুদ্দেশ্য পূর্ণ গভীর অর্থযুক্ত মন্ত্রটী পতিকর্ত্তৃক উচ্চারিত হইলে পত্নী পতিগোত্রে আপনাকে অভিহিতা করিয়া অবনতশিরে পতিকে অভিবাদন করেন। অর্থাৎ কথাগুলি যেন শিরোধার্য্য করিয়া নিলেন, এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। তাহার পর "আয়ুষ্মতী হও" বলিয়া ভর্ত্তাও সেই কল্যাণময়ী জীবনসহচরীকে আশীর্ব্বাদ করেন।

তৎপর সুবাসিনী আর্য্যনারীর চরুভোজন। এইখানে

পায়স সাক্ষাতে করিয়া ভর্ত্তা সেই পরিগৃহীতা ভার্য্যাকে বলিয়া থাকেন যে, "এই রত্নভূত অন্নপাশ দ্বারা (অর্থাৎ অন্নই শরীর রক্ষার মূল এবং অর্থেতে সমস্ত প্রাণীই আবদ্ধ, সুতরাং অন্নকে অতি বহুমূল্য রত্নভূত পাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) এবং রত্নভূত জীবনসূত্র দ্বারা (অর্থাৎ বহুমূল্য জীবন দিয়া) আর সত্যগ্রন্থিতে (অর্থাৎ সত্য প্রতিজ্ঞা দ্বারা) আমি তোমার মন এবং চিত্তকে বন্ধন করিতেছি।" আর "তোমার হৃদয় আমার হউক এবং আমার হৃদয় তোমার হউক" অর্থাৎ উভয়ের হৃদয় এক হউক।

বস্তুতঃ পতির এই সারভূত সাদর সংক্ষিপ্ত কয়টী উক্তি নববধূর স্মরণ থাকিলে ইহারা যে চিরজীবনই অমৃতভোক্তা হইয়া জীবন সার্থক করিয়া যাইতে পারেন। যাহা হউক বামাসুন্দরীর স্বামী এই সমস্ত মন্ত্রের অর্থ ও আপনাদের জীবনের লক্ষ্য সময়ে সময়ে স্বীয় সঙ্গিনীর নিকট ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। এবং প্রসঙ্গ ক্রমে কখনও বা অনেক কথার অর্থ বামাসুন্দরী নিজেও জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতেন। যাহা হউক বলা বাহুল্য যে, আর্য্যজাতির এই সুমিষ্ট ভাবপূর্ণ বিধানের গুণেই ভারতের সতীকুল এমন করিয়া জীবনে ও মরণে পতিতে আকৃষ্টা ও অবরুদ্ধা হইয়া থাকিতে পারিতেছেন। সুখসম্পদের সময়ে পতির জীবিতাবস্থার কথা যাহাই হউক, পতির লোকান্তর গমনের পরে ভারতসতী বিধবার সহিষ্ণুতা ও

পাতিব্রত্য জগতে এক অতুলনীয় দৃশ্য। সামান্য কথা নয়, তাঁহারা বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা লইয়া নির্ভয়ে লোকান্তর পর্য্যন্ত যাইবেন। বস্তুতঃ এমন সতী ও এমন পতিপরায়ণা নারী-কুলের জন্য কি করিলে যে প্রকৃত আদর দেখান হয়, তাহা আর কথায় ব্যক্ত করা যায় না। মহাযোগী মহাদেব একবার সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, যাহার চিত্র দেখিলে ও মনে কত আনন্দ হয়। অবশ্য, এইরূপ দৃশ্য, এইরূপ নৃত্য ও এইরূপ আদর পৃথিবীর লোক আর কোথাও দেখে নাই। কিন্তু এই পতিনিন্দা শুনিয়া সতীর দেহত্যাগ ও সেই সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া পতির যে নৃত্য, ইহাও সতীত্বের এক দেশ দর্শন মাত্র। সতীর আসল সমগ্র জীবন দিয়া পূর্ণাবয়বের ছবি বিধবার মূর্ত্তি। ভর্ত্তৃমরণে তদায় বিয়োগবিধুরা সতী যখন অশ্রুজলে সিক্তা হইয়া হস্তের শঙ্খ বা স্বর্ণবলয় খসাইতে থাকেন, জন্মের মত এক এক করিয়া অলঙ্কারগুলি পরিত্যাগ করেন ও জীবনের জন্যই দৈন্যব্রত এবং দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যাহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্তা হয়েন, তখন একবার সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই তাকাইয়া দেখা উচিত, পতির জন্য সতীর আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠা ব্যাপারটা কি। বস্তুতঃ ভারত-নারীর পতি-ভক্তি ও পাতিব্রত্য একটা দেখিবার জিনিষ। একটী নিষ্ঠাবতী শুদ্ধচারিণী বিধবা আর এক জন যতি ব্রহ্মচারীতে কোনই প্রভেদ নাই। বরং ইঁহাদের একটা

বিশেষতা এই, তাঁহাদিগকে পুরুষ যতিদিগের মত গৃহ ত্যাগ কিম্বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয় না, দেবারা গৃহে থাকিয়াই শুদ্ধাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, একাহার, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দৈন্যব্রত ধারণ করিয়া ধন্যা এবং পূংকামা হইয়া যান। ফলে এই উচ্চ জীবন প্রদর্শন ও সতীত্ব প্রতিষ্ঠাই হিন্দুবিবাহের চরম ফল। অবশ্য পাশ্চাত্য সভ্যতায় অনুরঞ্জিতা চিরকুমারী সুসভ্যা নারীকুলের পরসেবা ও পরোপকারের ইচ্ছা প্রদর্শন, পৃথিবীর উপরে নারী জীবনে এক নূতন দৃশ্য। কিন্তু ভারত-সতীর আত্মত্যাগ, ভোগে জলাঞ্জলি ও যোগ তপস্যা দ্বারা জীবনে একটা প্রভাব জন্মান, অন্য কথা, কিছুরই সহিত ইহার তুলনা হয় না। আমার মতে নারীর পঞ্চবিধ আপৎপাতে অন্য পতিবিধান না করিয়া তপস্যার বিধানই শ্রেয়ঃকল্প এবং ইহাই প্রকৃত সুবুদ্ধি। বুদ্ধিমতী শ্রেয়ার্থিনী নারীগণ দেখিবেন, একটা ভোগ নিপত্তিতে অধোমুখে নামিবার পন্থা ও অন্যটা উন্নত মোক্ষ-ধামে যাইয়া আরূঢ় হইবার প্রশস্ত সোপান। প্রকৃত পক্ষে ভোগী বেশী সুখী না যোগী বেশী সুখী, অথবা কিসে জীবনের প্রকৃত কৃতার্থতা, ইহা সদাত্মা নারী মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। অবশ্যই বালবিধবাদিগের জন্য সকলেরই অন্তরে করুণা হইয়া থাকে, কিন্তু সেই কারুণ্যবশতঃ কেবলই অশ্রুপাত না করিয়া, তাহাকে যতি ব্রত দিয়া দেবভাবে আরূঢ়া করিতে পারিলে সেই রমণী একটী বরভূতা দেবী হইতেপারেন।

আর্য্যনারী বামাসুন্দরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গার্হস্থ্য জীবন।

'সকল দেশেই নারীগণ গৃহস্থকুলের সম্মানার্হা গৃহদীপ্তি ও গৃহের কল্যাণপাত্রী। বস্তুতঃই গৃহস্থের ঘরে স্ত্রীতে আর শ্রীতে কোনই প্রভেদ নাই। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি ও ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট ও উভয়েই উভয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তথায় পরম সুখ ও পরম কল্যাণ নিত্য বিরাজিত। আর যে গৃহস্থের ভার্য্যা স্বামীর ছায়ার ন্যায় অনুগতা সখীর ন্যায় প্রিয়কারিণী এবং অতি দক্ষতা ও হর্ষের সহিত গৃহকার্য্যে নিরতা এবং বিবাহকালে প্রতিশ্রুত স্বামীর পঞ্চমহাযজ্ঞে সহায়তা করিবার জন্য নিয়তই সমুৎসুকা, সেই নারী নিশ্চয়ই সেই ভাগ্যবানের গৃহে পূজার্হা গৃহদীপ্তি। অনেকেই জানেন, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, পিতৃপূজা, অতিথিসৎকার ও ভূতবলি এই পাঁচটী আর্য্যবিধানে গৃহস্থগণের অবশ্য কর্ত্তব্য পঞ্চ-

মহাযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রদ্বারা বাস্তভূমি পবিত্র হয় ও তদ্যোগে পরমাত্মার আশীর্ব্বাদলাভ করা যায়। আর অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি অর্থাৎ আত্মার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। তৃতীয় পিতৃপূজা দ্বারা স্বর্গীয় পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন ও তাঁহাদের সহিত সেই বংশধরের এক অতি সুমিষ্ট প্রাণের যোগ রক্ষিত হয়। আর অতিথিসৎকার দ্বারা স্বদেশী বিদেশী, স্বজাতি পরজাতি ও শত্রু মিত্র এই সমস্ত পরিকল্পনা ভুলিয়া নির্ব্বিশেষে মনুষ্যপ্রেম শিক্ষা হয়। উক্ত আছে, অতিথির জাতিবর্ণ কিংবা নিবাস জিজ্ঞাসা করিতে নাই, কেননা, তাহাতে ব্রতের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হয়। আর পঞ্চম ভূত বলি বা জীব-সেবা; এই উপক্রমে ভূচর, খেচর, পশু, পক্ষী, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি বুভুক্ষু অন্নভোজী প্রাণীমাত্রকেই সাদরে অন্ন প্রদান করা হইয়া থাকে। সজ্জনেরা অবশ্য ভোজনের পূর্ব্বেই একটী পরিষ্কৃত স্থানে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্ষুধিত জীব সকলকে অন্ন দিয়া থাকেন। আর সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিধান এই বলিভুক্ কাকাদির নিমিত্ত সকলকেই ভোজনান্তে শত অন্ন পরিত্যাগ করিতে হয়। একবারে পাত্রহীন করিয়া ভোজন অত্যন্ত দরিদ্রতা, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। প্রকৃত পক্ষে জীব পোষণ ও জীব তোষণের জন্যই এই ব্যবস্থাটুকু মনস্বী আর্য্যজাতিতে নিবদ্ধ হইয়াছে।

যাহা হউক যদিও সময়ের বিবর্ত্তেও পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে অধুনা এই জাতির সমস্ত ভাবেই

কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তথাপি অত্যন্ত আনন্দের কথা এই, যে এখনও—এই বহু যুগযুগান্তর পরেও আর্য্যতার একবারে বৈরুব্য হয় নাই। আজিও সজ্জনদিগকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রাচীন মন্বাদি প্রণীত আচার ধর্ম্ম ও জীবনগত বেদোক্ত আর্য্য ধর্ম্মই এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। সকলে না হউক সজ্জনেরা এখনও নিদ্রোত্থিত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধানে গৃহশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি ও যথাবিধি শরীর মন প্রক্ষালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতে না পারিলেও ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগিয়া মুখ প্রক্ষালনের পর অন্ততঃ ধৌত বসনটুকু পরিয়া আচমন পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া ব্রহ্ম ধারণা ও ব্রহ্ম ভাবনা করিতে ভুলেন নাই। তাহার পর স্নান ভোজনাদিও সকলই সেই বেদোক্ত গার্হস্থ্য বিধানেই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

অধুনা যদিও অনেকেই মনে করিতেছেন যে, এইক্ষণে ভারতে আর বেদ প্রভাব নাই, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ একবারেই বেদ বিবর্জ্জিত। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের এই বিবেচনা নিতান্তই ভ্রান্তিসংকুল। এই উপক্রমে সকলকেই মনে করিতে হইবে, এতদ্দেশে যতদিন উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তিত থাকিবে ও বিপ্রদিগের বৈদিকী ত্রিসন্ধ্যা থাকিবে এবং ঋক্ যজু সাম এই বেদত্রয়ের সারভূত ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য একাক্ষর প্রণব সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে উচ্চারিত হইবে, আর ব্যাহৃতিত্রয় সহিত বেদসার গায়ত্রী অর্থাৎ

ভূলোক দ্যুলোক ও স্বর্লোক এই ত্রিলোকে পবিত্রব্যাপ্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের ধ্যান ধারণা থাকিবে, ততদিন এই দেশ হইতে বেদ বিলুপ্ত হইয়াছে, এই কথা বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানিগণ একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন, বিপ্রগণ রোজ রোজ যে ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে অতি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ বেদ পাঠ করিয়াই মন্ত্রাভিষেক, অঘমর্ষণ ও অতি সুললিত ছন্দোবন্ধ বাক্যে বেদ মাতা সাবিত্রীর বন্দনা ইত্যাদি বেদ ভাগ লইয়াই আজি ও আহ্নিক্যাচার প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তবে আর ভারত বেদবিহীন হইয়াছে, এইকথা জ্ঞানিগণ কেনই স্বীকার করিবেন। তবে অবশ্য কর্ম্মহীন বেদবিদ্যা অর্থাৎ শুধু কবিত্বের ভাবে বা কেবলই ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য যে বেদাংশ অধুনা ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে আলোচিত হইতেছে, তাহা সাধারণ ভাবে এই দেশে নাই। প্রকৃত পক্ষে সেই বাক্‌পাকমোর প্রয়োজনীয়তাই বা কি। আসল জীবনের সঙ্গে মিশাইয়া জাতিগত ভাবে যতটুকু থাকা আবশ্যক, সেই জীবনগত বেদ দেশের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম ভদ্রলোক হইতে হাড়িডুম চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই জীবনে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। জীবিতে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া এবং উপনয়ন এই দশবিধ সংস্কার ও মৃত্যুতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং পারলৌকিককৃত্যশ্রাদ্ধাদি আজিও বেদমন্ত্রেই অনুষ্ঠিত

হইতেছে। তাহাও কেবলই অন্ধভাবে নয়, এক একটা করিয়া প্রত্যেক মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে; শাস্ত্রে একটু অধিকার থাকিলে সেই সমস্ত মন্ত্রার্থ সকলেই বুঝিতে পারেন। তাহার পর কোন মন্ত্রের রচয়িতা কে, পড়িবার ছন্দই বা কি, মন্ত্রের দেবতা কে এবং কোন কার্য্যে ইহার বিনিয়োগ অর্থাৎ ব্যবহার এই সমস্ত তত্ত্ব মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে গাঁথা রহিয়াছে। মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে সকলকেই তাহা একবার পাঠ করিতে হয়। অবশ্য সর্ব্বসাধারণ লোক এই সমস্ত মর্ম্ম বুঝেন না, এই কথাটী নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গেও নিরপেক্ষভাবে সকলকেই বুঝিতে হইবে, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্ব্বসাধারণ লোক দীর্ঘকাল সাধ্য ব্যাকরণাদি এবং অর্থ বুঝিবার জন্য টীকা টিপ্পনি ও ভাষ্য পড়িয়া সময়ক্ষেপ করিলে চলে না, তাহা হইলে দেশের অন্ন বস্ত্র যোগায় কে এবং বিষয় বাণিজ্য করিয়া রাজ্য রক্ষাই বা হয় কিপ্রকারে, সুতরাং কেবল হিন্দু কেন, সমস্ত মুসলমান, কিম্বা খ্রীষ্টানমণ্ডলীও কোরাণ এবং বাইবেলের অর্থ না বুঝিয়া ও ভজনকালে স্ব স্ব মণ্ডলীর সহিত দণ্ডায়মান হন এবং হৃষ্টচিত্তে নমাজ পড়েন ও প্রেয়ার করেন এবং জাতীয় ধর্ম্মের অনুশাসন জীবন দিয়া বহন করেন, সাধারণতঃ ইহাই যথেষ্ট। তদ্রূপ আর্য্যজাতির ও সার্ব্বজনিক ভাবে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা ঐ রূপই মনে করিতে হইবে। এরই মধ্যে ও আর্য্যজাতি অত্যন্ত চিন্তাশীল বলিয়া সমাজের

চতুর্থাংশ লোক একবারে চিহ্নিত করিয়া ধর্ম্মের বাহ্ চিন কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, আর এক চতুর্থাংশ দেশের শান্তি রক্ষা ও রাজ্যের উন্নতির জন্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, অপর চতুর্থাংশ বিষয়বাণিজ্যে বিরত ও অবশিষ্ট চতুর্থাংশ সুন্দর সেবারত নিয়া সমাজের পরিচর্য্যা করিতে স্বাধীন ভাবে নিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই জাতিকে ধর্ম্মত একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরিবার বলিলেও হয়। যাহা হউক উপরে যাহা উক্ত হইল সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে এর চেয়ে আর অধিক কিছু কোন সম্প্রদায়ই প্রতর্ষণা করিতে পারেন না, সাধারণ গৃহস্থ নরনারী সকলকেই আপন আপন পক্ষির পুরোহিত, মুল্লা মৌলবী ও পাদ্রিদিগকে সারথি করিয়াই জীবনে অগ্রসর হইতে হয়। অধুনা যিনিই যাহা বলুন না কেন, ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মযাজকগণ সমাজের নেতা স্বরূপ এবং সমাজের নরনারীর অত্যন্ত হিতকারী সুহৃদ।

এর মধ্যেও আর্য্যজাতির গার্হস্থ্য বিধানে নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কর্ম্মের এত প্রাবল্য যে, সেই মধুচক্রে মধু আহরণ করিতে পুরোহিত না হইলেই চলে না। সকলেই জানেন, এতদ্দেশে এই ধর্ম্মতঃ হিতকারী সুহৃদদিগের আদর এবং পরিচর্য্যা করিবার জন্য এবং গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য পঞ্চমহাযজ্ঞে সহায়তা করিবার জন্য এতদ্দেশের নারীগণ বিশেষরূপে ব্রতিনী। প্রকৃত প্রস্তাবে এতদর্থে তাঁহারা বিবাহের সময়েই সাদরে প্রতিশ্রুতা হইয়া আইসেন।

যাহা হউক ইহা নিতান্তই এক সুখের বার্ত্তা যে আর্য্যা বামাসুন্দরী ঐ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রবর্ত্তিত আচার নিষ্ঠা ও সর্ব্বপ্রকার জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রবর্ত্তনার সহিতই তাঁহার ঐ অতি সুমিষ্ট গার্হস্থ্য জীবনে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমরা এইখানে এই উপক্রমে তাঁহার লৌকিক জীবনই বর্ণন করিব।

পণ্ডিতভার্য্যা বামাসুন্দরীর গার্হস্থ্যজীবন যে খুব উন্নত ছিল, এ কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু তিনি গৃহকার্য্যে সুদক্ষা ও আচারবতী ছিলেন এবং তাঁহার কাজ কর্ম্মের পরিচ্ছন্নতা ছিল, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারি। অবশ্য ইনি কোন সময়েই আঢ্যা ছিলেন না, নিজ হস্তেই অনেক সময়ে গৃহের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিতে হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, গৃহের ছোট বড় সকল কাজেই তিনি কৃতাভ্যাসা ছিলেন। ফলে সাধারণ ভাবে এতদ্দেশের পারিবারিক গঠনই এইরূপ যে, গৃহিণী-দিগকে বাঁধা হইয়া সেবাব্রত গ্রহণ ও গৃহের উনকোটি কাজ অভ্যাস করিতে হয়। সহরের কথা যাহাই হউক পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঘরের কুল-লক্ষ্মীরা রন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া আচমনের জল ও দন্ত কাষ্ঠটা পর্য্যন্ত বহন করিয়া দেন।

বিবাহের পর বামাসুন্দরীর স্বামী আরও তিন বৎসর ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহীনন্দগ্রামে শিবানন্দ বিদ্যা-

বাচস্পতি নামক একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট থাকিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তৎপর পত্নীর কোন এক সুবিজ্ঞ আত্মীয়ের পরামর্শে ইনি টোল করিবার সঙ্কল্প মন হইতে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া অল্প কয়েক দিন ময়মনসিংহ নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তাহার পর শিক্ষাবিভাগে আসিয়া একটী মধ্যশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সম্মানিত ডিঃ ইঃ বাবু নবকিশোর সেন ইহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাহার পর ইনি যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ঐ স্কুলটী পূর্ব্ববঙ্গেরই এক প্রান্তভাগে কোন এক পার্ব্বত্যজাতির শিক্ষার জন্য দয়ালু পাদ্রি প্রাইস্ সাহেব প্রথমতঃ স্থাপিত করেন। পরে আবশ্যক বোধ হওয়াতে তাঁহাই সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। ইনি এই স্কুলে আসিয়া অল্প দিন মধ্যেই চতুর্দ্দিগস্থ লোকের মন আকর্ষণ পূর্ব্বক ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া স্কুলের অবস্থা উন্নত করিয়া তুলেন এবং স্বীয় প্রণয়িণী ভার্য্যাকে স্বসন্নিধানে আনয়ন করিয়া উভয়েই মনের আনন্দে ও পরম শান্তিতে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। ইহাতে বামাসুন্দরীরও স্বাধীন ভাবে গৃহিণীর কার্য্যভার লইয়া পতিসেবায় নিযুক্ত হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। অবশ্য কোন নারীই পতিসন্নিধানে আসিবামাত্র উৎকৃষ্টা গৃহিণী হইয়া গৃহশোভা সবর্দ্ধন করিতে সক্ষমা

নেতন, কিন্তু অনুকূল ঘটনা ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকিলে সহজেই, পতির কল্যাণ প্রবর্ত্তনাতে আসিয়া যোগদান পূর্ব্বক জীবনের সুখ সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া লইতে পারেন।

যাহা হউক ইহারা পতিপত্নী উভয়েই সময়ে সময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন যে ঐ বন্যজাতির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে তাহারা যে সুখে ও শান্তিতে ছিলেন, তেমন সুখ ও তেমন শান্ত জীবনে আর কোথাও পান নাই। বাস্তবিক নির্জ্জনে লুকাইয়া প্রণয়সাধন বা জীবনের মিষ্টতা সম্ভোগ বড়ই আনন্দকর। তথায় বিদ্যালয়ের অবকাশ সময়ে প্রায়ই কোন সদ্‌গ্রন্থ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পত্রিকা পাঠ ও তৎপ্রসঙ্গে উভয়ের কথোপকথন হইত। এই সময়ে বিশেষ কোন কারণে কোন দিবস স্বীয় প্রেমাস্পদ স্বামী স্থানান্তরে গমন করিলে ঐ পতিসঙ্গিনী দেবী যেন কেমন এক তৃষিতা হইয়াই পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন। সেই ব্যাকুলতা সেই উৎকণ্ঠা ও সেই পথ নিরীক্ষণই বোধ হয় সেই অভিনব জীবনের উপাদেয়তা আরও বাড়াইয়া দিত। ফলে দুঃখই সুখের পরিমাপক, বিচ্ছেদই সম্মিলনের মাহাত্ম্যবর্দ্ধক, দেখা গিয়াছে তখন প্রিয়সমাগম হইলে দেবীর আনন্দের আর সীমা থাকিত না। অহো দম্পতির সেই নির্জ্জন কুটীরবাস ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সরল অনুরাগ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তৎসময়োচিত সদ্ভাব নিচয় স্মরণ করিতেও মনে

কেমন এক আনন্দ হয়। কিন্তু হায়! কোন অবস্থাই মনুষ্যকে নিয়া চিরদিন একভাবে থাকিতে দেখা যায় না; বিধাতার ইচ্ছাই যেন তাহার জীব নূতন নূতন অবস্থায় আরূঢ় হইয়া নব নব আনন্দ সম্ভোগ করিবে। অল্প দিন মধ্যেই পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হইয়া তজ্জন্য একটু অসুস্থ ও উদ্বিগ্না হইয়া পড়েন এবং নিতান্ত বাধ্য হইয়াই মাতার সঙ্গে স্বদেশে চলিয়া যান এবং যথা সময়ে একটী পুণ্য দিনে (মহা-মহা বারুণী দিবস) এক সুলক্ষণা কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া সুহৃদ্দিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তাহার পর কতিপয় মাস অতিক্রম হইলে সেই নির্জ্জন-সহচরী আবার আসিয়া প্রিয়-পতির সহিত মিলিতা হয়েন ও আবার আনন্দের তরঙ্গ পতিপত্নীর সেই সম্মিলিত ক্ষুদ্রজীবন রতঙ্গিনী দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।

দেখা গিয়াছে, মানুষ সদিচ্ছা লইয়া জীবনক্ষেত্রে দাঁড়াইলেই তাহার গন্তব্য পথ বিধাতা আপনিই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বঙ্গদেশে যখন পাঠশালা প্রবর্ত্তিত হয়, সেই সময়ে এই বঙ্গবিদ্যালয়েরও চতুর্দ্দিকে ঐ পার্ব্বত্যাংশে বহুতর পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী দিগের প্রবর্ত্তনায় সেই সমস্ত পাঠশালার গুরুগণ প্রতি রবিবার আসিয়া ঐ মডেল বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট পাঠ শিক্ষা করিত। তদুপলক্ষে ঐ সমস্ত পাঠশালার গুরু ও ছাত্র দিগের সহিত ইঁহার এক বিশেষ সম্বন্ধ ও ভালবাসা সংস্থাপিত

জন। তন্নিবন্ধন তাহাদের পরিবারস্থ মেয়েরাও অনেকেই ঐ পূজ্যতমা পণ্ডিত বনিতার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। যে শ্রেণীর লোকই হউক না কেন, অতি ক্ষুদ্র হইলেও আসল মনুষ্যত্ব ও ভালবাসার বীজ সকলেতেই একরূপ; তদ্দ্বারা তাঁহারা ঊর্দ্ধে দেবতা; মধ্যে মনুষ্য ও নিম্নে পশুপক্ষীকে পর্য্যন্ত ভালবাসিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। ইনি একে তো ব্রাহ্মণ-কন্যা তাহাতে আবার সকলেরই আপন আপন পরিবারস্থ স্নেহাস্পদ বালকগণের শিক্ষাদাতা গুরুর ভার্য্যা, এই নিমিত্ত সেই অন্ধবন্য সরল স্বভাবা গ্রাম্যনারীগণ প্রায়ই তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিত এবং সাক্ষাৎ হইবা মাত্র পদসন্নিধানে শির নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। তন্মধ্যে একটী প্রবীণা চণ্ডালকন্যার আদর ও ভক্তিতে বামাসুন্দরী বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। ঐ ভাগ্যবতী গৃহস্থ কন্যা রিক্ত-হস্তে কখনও দেবীকে দর্শন করিতে আসিত না। প্রায়ই কিছু দুগ্ধ, কলা, ইক্ষু ও কোন কোন দিন দৈ চিড়া অথবা নূতন পরিষ্কার গুড় নিয়া আসিত এবং তাহা দিয়া দেবীকে প্রণাম করিত। বামাসুন্দরীর স্বামী আদর করিয়া ইহাকে সিদ্ধশ্রমণা বলিতেন। আর দেবী নিজেও তাঁহার সেই ভক্তিমতী শ্রমণা আসিলে অত্যন্ত আদর করিয়া ভোজন করাইতেন। সকলেই জানেন, ভালবাসার বিনিময়ই তাহার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক ও তাহাকে দীর্ঘজীবী করিবার এক অমোঘ উপায়। তবে অবশ্য ইহারা সভ্যতা ভব্যতার

বিশেষ কোন ধারই ধারে না। কিন্তু সরল প্রাণে ও সাদা সিধে কথায় তাহারা যেমন ভালবাসা দিতে জানে, সুসভ্য নারী সমাজে বরং সকল সময়ে ততমনটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক বামাসুন্দরী এই খানে তাঁহার সেই সরল স্বভাবা গ্রাম্যনারীদিগকে পাইয়া সর্ব্বদাই আমোদ অনুভব করিতেন, তাহার মধ্যেও মণিপুরী রমণীরা অনেক সময়েই তাঁহার সমধিক কৌতুহল চরিতার্থ করিত। তাহার পর তিনি সকলেরই সহিত এমনি অমায়িকভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন যে, তাঁহাতেই তাহারা ইঁহার নিকট আসিলে আর সহসা উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করিত না। ফলতঃ ভালবাসা জগতে এক অপূর্ব্ব জিনিষ, যে সূত্রে হউক এতদ্দ্বারা দেব দানব মানব ও পশুপক্ষী সকলকেই বশ করা যায় ও সকলেই ইহার জন্য লালায়িত।

তাহারপর আরও একটী সূত্রে এই প্রদেশে ইঁহাদের বাস অতিশয় সুখপ্রদ হইয়াছিল, কিছুদিন পর ঐ বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুগত গুরুমহাশয়দিগকে নিয়া এঁকমাসিক সভা সংস্থাপিত করেন। সেই সভায় প্রীতি উৎসাহের সহিত বক্তৃতা ও গুরুমহাশয়দিগের রচনা পাঠ হইত। আর কোনও সময়ে কোন গ্রামের পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যা হ্রাস কিংবা স্থানীয় লোকের উৎসাহ ভঙ্গ হইতেছে দেখিলে ঐ সকল পাঠশালায় গুরুমহাশয়দিগের প্রার্থনামতে ঐ সভার সভ্যগণ সময় সময় তত্তৎ স্থানে যাইয়া সেই সেই গ্রামের

প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকিয়া সভা করিতেন এবং যখানে যে বিষয়ের অভাব থাকিত, সেই সভার অনুরোধে তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হইয়া যাইত। কেবল তাহাও নয় এর সঙ্গে সঙ্গে আমোদ প্রমোদেরও বিলক্ষণ প্রবর্ত্তনা ছিল, সেই সরল ও শুদ্ধমনা গ্রাম্য গুরুগণ স্ব স্ব পাঠশালার ছাত্রদ্বারা এক এক সময় প্রচুরতর দুধ তরকারী গুড় ইক্ষু ও অন্যান্য যখনকার যে ফল সংগ্রহপূর্ব্বক একযোগে আনিয়া এই আবাল্য শিক্ষক গুরুদেবের আবাসে আনিয়া রাশীকৃত করিত এবং তদ্দ্বারা তাহাদের একত্র ভোজ হইত। এতদ্বিষয়ে ঐ কার্য্যকুশলা পণ্ডিত ভার্য্যা দেবী ও আবার এই সমস্ত বস্তু দ্বারা এমনি ভাবে সেই ভোজের আয়োজন করাইয়া দিতেন যে, তাহাতে হিন্দু মুসলমান কাহারও কোন আপত্তি হইত না, নানা শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে সকলই যার যার ভাবে বসিয়া যে, যে বস্তু খাইতে পারেন সেই বস্তু সাক্ষাতে নিয়া অপূর্ব্ব আমোদ সম্ভোগ করিতেন। বস্তুতঃ ঐ সমস্ত গ্রাম্য ছাত্র এবং গ্রাম্য গুরুগণের নিকট সেই উৎকৃষ্ট দধি, ক্ষীর লুচি পায়স দেবভোগ বলিয়াই মন্যমান হইত। অনেক সময় নিকটস্থ সহর শিলচর হইতেও জেলা স্কুলের সুযোগ্য হেডমাষ্টার অভয় বাবু, সেকেণ্ড মাষ্টার প্রসিদ্ধা রমাবাইর স্বামী বিপিন বাবু, বিদ্যোৎসাহী তদানীন্তন ডিঃ ইঃ হরকিশোর বাবু, দেওয়ানীর সেরেস্তাদার রামচন্দ্র বাবু ও তদানীন্তন মুন্সেফির সেরেস্তাদার জয়কুমার

বাবু প্রভৃতি অতি উচ্চ পদস্থ বিদ্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকগণ উক্ত বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আহ্বানে সেই গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের সভা ও প্রীতিভোজে যাইয়া যোগদান করিতেন। এতদ্দ্বারা আমি ইহাই ব্যক্ত করিতেছি যে, প্রকৃত ভালবাসা ও বিশুদ্ধ আমোদ দিতে পারিলে, সকলকেই প্রলুব্ধ করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ শিক্ষিত লোকের পক্ষে কাজ ও আমোদ এই দুয়ের সম্মিলন হইলেই অপূর্ব্ব আনন্দ।

এইরূপে এই স্থানে ইঁহাদের কতিপয় বৎসর অতীত হইলে পর সেই বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিলচরে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কার্য্যকরী সভা ও গ্রাম্য আমোদ প্রমোদও ভাঙ্গিয়া যায়। অবশ্য এক দিন সকল কার্য্যেরই শেষ আছে, জন্মিলেই মৃত্যু আছে, বর্দ্ধিত হইলেই ক্ষয় পাইতে হয়; তদ্রূপ হাসিখুসি ও আমোদ প্রমোদেরও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা অবশ্যই আছে। তথা হইতে ইঁহাদের আসিবার দিন তৎস্থানায় গুরু ও ছাত্রদিগের এক সভা হয়, তাহাতে বক্তৃতাদি উচ্চবাচ্য কিছুই হয় নাই, নীরবে অশ্রুপাতই এই দিবসের একমাত্র কার্য্য বা পূর্ণাহুতি। অবশ্য সকলই জানেন প্রেমলীলার আরম্ভ আশা ও হাসি খুসি লইয়া কিন্তু শেষ সর্ব্বত্রই নৈরাশ্য, ক্রন্দন ও অশ্রুজলে।

যাহা হউক দেখা গিয়াছে, শিলচরে আসিবার পর,

বামাসুন্দরী একজন অতি সুদক্ষা গৃহিণী; ফলতঃ বিবিধ ঘটনা, বিবিধ সংসর্গ ও বিবিধ লৌকিক ব্যবহারেই মানুষকে সুন্দর করিয়া গঠন করে। বাসায় ভৃত্য না থাকিলে অনেক সময়েই ইঁহাকে নিজ হস্তে গৃহের তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে কিন্তু প্রশংসা এই, তাহাতে কাহারও দোষ ধরিবার যো থাকিত না. ফলে গৃহকার্য্যের পরিচ্ছন্নতা ও ইঁহার গার্হস্থ্য-জীবনের এক বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল।

আর রন্ধন বিষয়েতো আত্মীয় স্বজন এবং নগরস্থ নানা প্রদেশীয় প্রাতবেশীমণ্ডলীর নিকট ইহাঁর কত প্রশংসাই ছিল। চুলটা নিবাসী সম্মানিত এঃ কঃ বাবু দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় অনেক সময়েই দেবীর স্বামীকে বলিয়াছেন যে, "মহাশয়! তেল ঘি অবশ্য অনেকেই খরচ করেন কিন্তু মুক্তের মা যেমন অল্প বস্তু দিয়া উৎকৃষ্ট রন্ধন করেন, এমন অন্য কাহাকেও প্রায় দেখি না। আর এক কথা এই অনোরা দশটা পাক করিলে হয় তো কয়েকটা খুব উৎকৃষ্টই হইল, আর অপরগুলি অতি সামান্য রকমের হইয়া পড়ে। কিন্তু ইঁহার হাতে যেন আগা গোড়া সব এক সমান সুতার হয়।" বস্তুতঃ ইহাই বামাসুন্দরীর পাকের বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল।

বামাসুন্দরীর একজন তোৎলা মামা ছিলেন, লোকটা বড়ই উচিত বক্তা, তিনি কাহাকেও বড় খাতির করিতেন না, বৌ ঝিরা তাঁহাকে খাওয়াইতে বড়ই সশঙ্কা থাকিতেন। কিন্তু তিনিও একদিন বামাসুন্দরীর হাতের

নিরামিষ রন্ধন ভোজন করিয়া নিতান্ত প্রশংসার উপরেও আবার একটী কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন সুস্বাদ ডাইলের বড়া কিন্তু আমি আর কখনও খাই নাই।"

কৃষ্ণপুর স্কুলে অবস্থানকালে একদা একজন সম্ভ্রান্ত পুলিসকর্ম্মচারী বামাসুন্দরীর স্বামীর নিকট অতিথি হইয়াছিলেন, তাহাতে বামাসুন্দরী কাঁটা খুদিয়ার ডুগি, কাঁটালবীচি ও বেগুন দ্বারা যে এক ব্যঞ্জন পাক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভোজন করিয়া ঐ ভদ্রলোক বহুদিন পর্য্যন্ত বামাসুন্দরীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি ঐ সুস্বাদ ব্যঞ্জনের কথা বলিয়া দেবীর প্রশংসা করিতেন। বস্তুতঃ সামান্য বস্তুকে উপাদেয় করিয়া তুলা খুবই এক বাহাদুরী। এই গুণটী বামাসুন্দরীর অবশ্যই কতক ছিল।

একবার শিলচরের অতি সম্মানিত একজন এঃ কমিশনার বাবু জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয় বামাসুন্দরীর পাতলা রুটি পিঠার সহিত কবুতরভাজা খাইয়া স্বীয় গুণবতী ভার্য্যার নিকট ইহার জন্য কত প্রশংসাই করিয়াছিলেন। ফলে সামান্য বস্তুতে আস্বাদ যোজনা করা অবশ্যই খুব এক প্রশংসার বিষয়।

বামাসুন্দরীর স্বামীর নানা বিষয়ে সাহায্যকারী শিলচরের একজন প্রসিদ্ধ সদাত্মা বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত ও বর্ণারপুর বাগিচার সম্মানিত মেনেজার বাবু দীননাথ দত্ত এই দুই জনই কখন কখন বামাসুন্দরীর স্বামীর সাদর আহ্বানে

তদীয় আবাসে আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও আর্য্যা বামাসুন্দরীর সেই আড়ম্বরশূন্য বিশুদ্ধ নিরামিষ শাকসব্জিতেই পরিতুষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে। ফলে ইহাও বামাসুন্দরীর খুব এক সৌভাগ্যই বলিতে হইবে যে, তাহার সেই অতি সামান্য বস্তুতে মহাত্মা লোকেরাও পরিতুষ্টি লাভ করিতেন।

ঢাকানিবাসী একজন স্কুল সব্ ইনেসপেক্টর মুক্তকেশীর মাতার নিরামিষ রন্ধন খাইয়া সর্ব্বদাই প্রশংসা করিতেন। বিশেষতঃ তাহার কাছে ইহার বুটেরডাল, কাঁচা অম্বল ও তিলের বড়ার বড়ই প্রশংসার ছিল। বাস্তবিক কাঁচা অম্বল ও তিলের বড়া ইহার হাতে অতি উৎকৃষ্ট হইত; একটা বড়াও একটু ভাঙ্গাচুরা বা বাঁকা কুঁচা হইত না। আর কাঁচা অম্বলের ও জামির নারিকেল ও তিল প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণের সহিত মিষ্টি ও টকের এমন একটা সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারিতেন যে, তাহাতেই ইহা উপাদেয় হইত।

ইহার কিছু দূরসম্পর্কিত গুন্যাউক নিবাসী অভয়চরণ চৌধুরী নামে একজন সম্ভ্রান্ত ধনী লোক একবার বামাসুন্দরীর হাতের লুচি এবং ডাইল ডালনা ও নিরামিষ চড়্চড়ে খাইয়া বলিয়াছিলেন যে, পিশি! এমন লুচি ও নিরামিষ তরকারী আমি আর কোথাও খাই নাই। আর বানিয়াচঙ্গ নিবাসী কীর্তিরত্ন মহাশয়ও ইহার পক্ব লুচির সর্ব্বদাই অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন।

বিক্রমপুর নিবাসী কবিরাজ হরিমোহন সেন মহাশয় অনেক সময়েই বলিয়া থাকেন যে, ইনি কেবল যে উত্তম রন্ধন করিতে পারিতেন তাহা নহে, ইঁহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিলেই মনে মনে একটা শ্রদ্ধা হইত এবং অনেক সময়ে বোধ হইত যেন লক্ষ্মী দেবভোগের জন্য রন্ধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মার নিকট দেবীর বড়ই সমাদর ও সম্মান ছিল।

বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা আমি বামাসুন্দরীর কেবল পাকের প্রশংসা করিতেছি না, তাঁহার প্রতি যে সকলেরই একটি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল এবং তজ্জনিত তিনি যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই যে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হইত ইহাই আমি এই ছলে ব্যক্ত করিলাম। তাহার পর সাধারণ ভাবে ইহাও বলিতেছি যে, নারীর গার্হস্থ্য জীবনে যতপ্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে রন্ধন এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য। ইহা দ্বারা ইষ্টমিত্র ও পরিবারস্থ সকলকেই রোজ রোজ অতি সহজে পরিতুষ্ট করিতে পারা যায়। অতএব গৃহিণী মাত্রেরই যত্ন-পূর্ব্বক রন্ধন শিক্ষা করা আবশ্যক।

আর্য্যা বামাসুন্দরীর আর একটী সৌভাগ্য এই যে, সর্ব্বত্রই নারীসমাজে তাঁহার আদর ছিল। কেবল কাজ-কর্ম্মে নয়, তাঁহার চরিত্রের মিষ্টতা ও আমোদপ্রিয়তাতেও তাঁহার প্রতি সকলে আকৃষ্টা হইতেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর ভদ্র মহিলাগণের সহিত সভ্যতা-ভব্যতায় আলাপ করিতে

যেমন নিপুণা ছিলেন, আবার ক্ষুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া হাস্য পরিহাস ও আমোদ প্রমোদের অবতারণা করিতেও বিলক্ষণ পটুতরা ছিলেন। ফলে, তাঁহার এই গুণে সর্ব্বত্রই বৌ ঝিরা তাঁহাকে বড় পছন্দ করিতেন ও অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন।

এতদ্ভিন্ন বামাসুন্দরীর আর একটী গুণ ছিল, তিনি স্বহস্তে অতি পরিষ্কার সরু বেত উঠাইয়া অতি সুন্দর বোতর সের, টুরি ও ডালা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। দেবীর স্বর্গারোহণের পর তাঁহার স্বহস্ত রচিত এবং সাদরে নানা স্থান হইতে সংগৃহীত গৃহস্থালীর বিবিধ প্রকারের বস্তুনিচয় ইহার প্রেম-মোহিত স্বামী অতি সমাদরে তাঁহার বাসভবনে যেখানে দেবী শয়ন করিতেন, তাহারই চারিদিকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সমস্ত জিনিস এবং দেবীর পেটেরাস্থিত পাতকাটা ও নারিকেলের চিড়ে ও জিবে কাটিবার ভিন্ন ভিন্ন রকমের দা, কেচি ও সন্দেশ প্রস্তুত করিবার বিবিধ প্রকারের সাঁচ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বামাসুন্দরী কেমন এক উত্তমা গৃহিণী ছিলেন।

তাহার পর দেবী যেখানে রোজ রোজ তাঁহার আদরের পুত্রকন্যা সঙ্গে করিয়া শয়ন করিতেন, তাহার উপরে চন্দ্রাতপ ও নিম্নে একখানা যোগাসন সংস্থাপিত করা হইয়াছে: দেবীর স্বর্গারোহণের পর প্রতি রোজ সায়ংকালে ঐ স্থানে ধূপ দীপ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার ছোট ছোট কন্যাপুত্রেরা

স্বর্গগতা জননীর উদ্দেশে অতিভক্তিসমাদরে প্রণিপাত করিয়া থাকে। প্রিয়তম পতিরও এইক্ষণে ইহাই সায়ংভজনের স্থান। সায়ংকৃত্যের পর তিনি প্রতি রোজ কোন এক ভক্তিগ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ করিয়া ভক্তিমিশ্রিত আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ভাল হউক আর মন্দ হউক পতিসন্নিধানে আর্য্যা বামাসুন্দরীর ইচ্ছাই গার্হস্থ্যজীবনের এক বিশেষ সমাদর।

আর্য্যনারী বামাসুন্দরী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্তান প্রবর্ত্তনা।

ভাবিয়া দেখিলে সন্তানই মনুষ্যজাতির ভাবীজীবন ও অনন্ত উন্নতির মুক্তদ্বার। সুতরাং সন্তানদিগকে যথাশক্তি সুনিয়মে পরিচালিত করা প্রত্যেক পিতামাতারই এক বিশেষ কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের জাতীয় প্রবর্ত্তনা ও জীবনাগতপ্রথা এই, তাঁহারা স্পষ্টরূপে বাক্‌শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চমবর্ষ বয়সে অতিসুন্দর ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত বালকদিগকে শিক্ষার দিগে উন্মুখ করিয়া দেন। এইখানে প্রত্যেক পরিবারেরই বেদগুরু পুরোহিত ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি বিদ্যার অর্চ্চনা করিয়া বালকগণকে বিদ্যারম্ভ করাইয়া থাকেন। তাহার উপরে আবার আর্য্যসন্তানদিগের বেদবিহিত দশবিধ সংস্কার আরও একটু উন্নতভাবের সন্তান প্রবর্ত্তনা। সকলেই জানেন, আর্য্যবালাবধূর প্রথমোন্মেষ সংস্কার বিবাহ হইতেই তদীয় সন্তানোৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সন্তান সম্বন্ধীয় কেমন সুমিষ্ট

একটু ধর্ম্মভাব-সংযোজিত করিয়া রাখা হয়। সন্তান প্রাপ্তির মূলে এই বেদবিহিত প্রাথমিক অনুষ্ঠানটুকু করিতে অবশ্য দেশের সকলেই বাধ্য। প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে হইবে, এই উৎকর্ষ প্রাপ্ত জাতীয় অধীনতাটুকই এতদ্দেশীয়দিগের আর্য্যতা।

এতদ্বিষয়ে আর্য্যাবামাসুন্দরীরও পূজনীয় জীবন সহচর অগ্রে পিতৃপূজা অর্থাৎ যাহাদিগের মধ্য দিয়া আসিয়া এই পুত্রাকাঙ্ক্ষা পুরুষ বংশ প্রবর্ত্তনার জন্য অধুনা এই সস্ত্রীক পাদবিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত, সেই পূজার্হ স্বর্গবাসীদিগেরই সন্তোষার্থ শ্রদ্ধার সহিত অন্নাদি দান এবং সেই আত্মাসকলের উদ্দেশে প্রণিপাত করেন। তৎপর জগৎপ্রসাবতা সবিতৃ-দেবকে অর্ঘ্যপ্রদান করা হয়। অনেকেরই বিদিত আছে, পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর কেন্দ্রীয় যে যে স্থানে সূর্য্যরশ্মি একবারেই পতিত হয় না, তথায় কোন একটা কীট পোকা কিম্বা একগাছা তৃণও জন্মায় না, সুতরাং ঈশ্বরীয় প্রেরণায় সূর্য্যই যে আমাদিগকে জড়ের মধ্য হইতে উঠিয়া আসিতে প্রধানরূপে প্রবর্ত্তনা দিতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বোধ হয় এই জন্যেই এই জন্মদ্বারে সেই মহোপকারী পদার্থকে সাদরে অর্ঘ্য দিয়া নমস্কার করা হয়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই কিন্তু ভিন্নদেশীয়েরা ভারতবর্ষীয়দিগকে জড়োপাসিক বলেন, তাঁহাদের নিকট এতদ্দেশের যাগযজ্ঞ পূজা সকলই অসার কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া সর্ব্বদাই তিরস্কৃত, কিন্তু সেই মহানুভবদিগের জানা উচিত, ভারতবর্ষীয়দিগের

সন্তান প্রবর্ত্তনা কিরূপ এবং তাহাতে কোনও সারবত্তা আছে কি না? একটু সুবিস্তৃত হইলেও এইখানে আমি তাহাদেরই অবগতির জন্য আর্য্য-জাতির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের [illegible] সূত্রগুলির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিব। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আর্য্য-জাতির এই সন্তানপ্রবর্ত্তনার, মূল সৌষ্ঠব বেদবিহিত দর্শনশাস্ত্র বর্ণনায় বারবার কাহারও আপত্তি খণ্ডনের জন্য অধিক কথা লিখিতে হইবে না।

পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন, এতদ্দেশে বহুকাল হইতে আধিজ্যোতি, আধিলোক, আধিবিদ্য, আধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম এই পঞ্চোপাসনা প্রধানরূপে প্রবর্ত্তিত। তন্মধ্যে জ্যোতিতে ব্রহ্মধারণা এক প্রধান বিষয়। দ্বিজগণ যে, দিবসে তিনবার আচমন ও প্রাণায়ামপূর্ব্বক দেহমন শুদ্ধ করিয়া গায়ত্রীজপ করেন তাহাতে এই জগৎপ্রসবিতা সূর্য্যদেবেরই অন্তর্ভুক্ত ভর্গাখ্য ব্রহ্মজ্যোতি ভাবনা করা হয়। যে জ্যোতি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিতেছে অর্থাৎ যাহার প্রভাবে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষণ হইতেছে। বাস্তবিক আধুনিক ব্রহ্মবাদিগণও ঐ পদার্থটুককেই আরও একটু সুস্পষ্ট করিয়া "জ্যোতির্জ্যোতি" বলিয়া ব্রহ্মসংগীতে গান করিয়া থাকেন।

তাহার পর আধিলোক অর্থাৎ বিশ্বব্যাপীরূপে ব্রহ্ম

* আদিত্যান্তর্গতং বর্চ্চো ভর্গাখ্যং মুমুক্ষুভিঃ

ভাবনা ইহা দ্বিতীয় প্রকারের উপাসনা। এই জ্ঞান লইয়াই ঈশ্বরকে বিষ্ণু ও বিশ্বমূর্ত্তি বলা হয়। এতদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সকলই ব্রহ্মময়, বিশ্বের অতি বৃহত্তম দৃশ্য পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদী ও সমুদ্রাদি হইতে অতি ক্ষুদ্র বালুকা কিংবা আরও ক্ষুদ্র একাধারে অণু পরমাণু পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি তাঁহার পূর্ণ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বিশ্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। এবং ইহারাও সকলেই আত্মবলিদান করিয়া প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিতেই রত। কেবল মুখের কথা নয়, এই জ্ঞান যাঁহাদের মধ্যে খুব গাঢ় হইয়া বসিয়াছে তাঁহারা বাম পার্শ্ব কিংবা দক্ষিণ পার্শ্ব মনুষ্যদের ভিতর দিয়া যাঁহাকে দেখেন, প্রত্যেক বালুকার ভিতরেও তাঁহাকেই প্রত্যক্ষ করেন। বোধ হয়, এই পরিপক্ক জ্ঞান লইয়াই এতদ্দেশে শালগ্রাম পূজা প্রতিষ্ঠিত। যে শালগ্রাম বিদেশীয় মাত্রেরই চক্ষুশূল, এবং যাহার মর্ম্ম দেশের শিক্ষিত মণ্ডলীরও এখন পর্য্যন্ত সম্যক পরিগ্রহ হইতেছে না। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত, এইটি মনস্বী আর্য্যজাতির জ্ঞানের অত্যন্ত পরিণতাবস্থার অনুষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে বলিতে হইবে ভারতবাসীর ঐ উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টি বা বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছিল কিনা, তাহারই নিদর্শন এই শালগ্রাম পূজা। আর্য্য সন্তানদিগের মতে ঈশ্বরোচিত বিষ্ণুজ্ঞান অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ধারণা খাটি করিবার জন্য শালগ্রাম পূজাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবর্ত্তনা। যোগী সন্ন্যাসি।

গণও শালগ্রামের বিশিষ্ট সমাদর করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে আর্য্য সন্তান স্থিরতত্ত্বরূপেই বিশ্বাস করেন, শালগ্রাম পূজা যিনি করেন, তিনিই প্রকৃত বিষ্ণুর পূজা করেন এবং শালগ্রামের প্রসাদ চরণামৃত যিনি গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত বিষ্ণুর চরণামৃত পাইয়া থাকেন ও প্রকৃত বিষ্ণুকে সমাদর করেন। নিশ্চয়ত এই স্থানে অন্য কোন অবতার ধরিয়া পূজা করিতে গেলে, সেই অর্চনা অনেক সময়েও দেখা যায় ঈশ্বরেতে যাইয়া পৌঁছে না। কিন্তু এই নির্গুণ শিলাতে সেই ভয় নাই, শালগ্রাম কাহারও ভাব ভক্তি পথে আত্মসাৎ করিয়া লয় না, আর ঈশ্বরত্বেরও কোন দাবি দাওয়া করিয়া কাহাকে বিরক্ত করে না, নীরবে বিশ্বপ্রাণ ভগবান্‌কেই ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। বস্তুতঃ ঐ ধারনাতেই শালগ্রাম দেবতা।

এই সম্বন্ধে আর ও একটু বিবৃত করা বোধ হয় আবশ্যকীয়। প্রস্তর শব্দটী প্রপূর্ব্বক স্তৃধাতুর পদ, ইহার অর্থ যে আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে আচ্ছাদন করে অর্থাৎ অষ্ট-ধাতুর রেণুকে নিজকে আবৃত করিয়া আত্মগঠন করে। একখণ্ড ভাল প্রস্তর ভগ্ন করিতে গেলে অনেক সময়েই দেখা যায় তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, ইহাতেই বুঝিতে হইবে, প্রস্তরে লৌহ তীব্রলৌহ ও স্বর্ণাদি ধাতু রেণুর সম্রব অবশ্যই আছে। তাহার মধ্যেও আবার গণ্ডকীস্থিত পাথরের একটু বিশেষতা এই; ইহা কীটচ্ছিদ্র বিশিষ্ট ঐ কাট সকল

শিলার অসার অংশ ভোজন করিয়া মণিপ্রবর্ত্তিত করে এবং তাহাই শালগ্রাম অর্থাৎ মণিময় চক্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পরীক্ষা এই, তথায় অবস্থানকালে ঐ কীট ভিতরে থাকাতেই অনেক সময়ে ইহাকে সচল অর্থাৎ গমনশীল দেখা যায়। এবং তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহার ভিতরে ঐ মণিরেখা বা মণিচক্র অবশ্যই আছে। সকলেই জানেন, মণিমুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন সমস্তই প্রায় কীটাদির লালামাত্র। এইখানেও ঐ লালাচক্র দেখিয়াই শালগ্রাম-আনীত হয়, এবং যথাবিধানে পঞ্চগব্য দিয়া ধৌত ও সাদরে বিবিধ তীর্থ বারিতে অভিষেক পূর্ব্বক তাহা বিষ্ণুধারণার যোগ্য করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর ঐ বিবিধ ধাতুরেণুর সংশ্রব ও মণিরেখা থাকার সদ্গুণও অবশ্যই কিছু আছে, ইহার দর্শনে স্পর্শনে চক্ষুরাদির জ্যোতি পবিত্র হয় এবং মৃদুভাবে হউক কিন্তু আন্তরিক ভাবেরও কথঞ্চিৎ নির্ম্মলতা অবশ্যই জন্মায়, ইহাও আর্য্যেরা অনুভব করেন। এই তো আর্য্যজাতির শালগ্রাম শিলার প্রকৃত বৃত্তান্ত। ইহার অণু পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু আছেন কিনা, তাহা জ্ঞাননেত্রে যাহার ইচ্ছা হয়, একবার অণুধ্যান করিয়া দেখুন।

প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান কিরূপ সাধন করিতে হয়, তাহাই এই স্থানে শিক্ষণীয়। তাহার পর কেবলই বিশ্বাসের কথা নয়, বস্তুতঃই যদি সমস্ত অণু পরমাণুর শক্তিরূপে ভগবানের

বিদ্যমানতা সর্ব্ববাদি সম্মত এক সত্যজ্ঞান হয়, তবে কেবল এই শালগ্রাম কেন জগতের যে কোন বস্তু সাক্ষাতে করিয়াই বিশ্বব্যাপী ভগবান্‌কে নমস্কার দেওয়া যাইতে পারে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ যাঁহারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন যে, "বিশ্বব্যাপী ভগবান্ সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, তুমি জড়জীব তরুলতা সবাকার প্রাণ; তাহাদের ভিতরে নিরখি তোমারে করি মিনতি প্রণাম।" তাঁহাদের জ্ঞান বিশ্বাস মতে ইহা স্বীকৃতই আছে, মনে করিতে হইবে।

তাহার পর আধিবিদ্য আর্য্যদিগের তৃতীয় প্রকারের উপাসনা। বিদ্যা শব্দের অর্থ শাস্ত্রোপাত্ত জ্ঞান, এবং তদ্যোগে উপাসনার নামই আধিবিদ্য উপাসনা। এইটিই মুসলমান সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা পেগাম্বরদিগের যখন যে আয়ত অর্থাৎ ঈশ্বরবাণী পাইয়াছেন, তাহাই কোরাণে নিবদ্ধ করিয়া তদ্যোগে ঈশ্বরধারণা করেন এবং তাহার বাহিরে আর কোন কথাই গ্রাহ্য করেন না। যাহা হউক শাস্ত্র অর্থাৎ সুচিন্তিত স্থির জ্ঞান অবশ্য সকলেরই মান্য, তথাপি এই উপক্রমে আর্য্য জাতির পরাবিদ্যা উপনিষদ্ ব্রহ্মারগতির জন্য অতি প্রসিদ্ধ। আর্য্যেরা তাহাকেই পরাবিদ্যা বলেন, যদ্দ্বারা অক্ষয় পুরুষকে জানিতে পারা যায়। আর পরোক্ষ বা পরম্পরাগত অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা করিয়া বা অন্যের মধ্যদিয়া যে ব্রহ্মাবগতি তাহা অশ্রেষ্ঠা অপরা বিদ্যা। নিশ্চয়ই এই পরাবিদ্যা পৃথিবীর ধর্ম্মরাজ্যে এক আশ্চর্য্য প্রতিভা।

যাহা হউক তদ্ভিন্ন তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানগুলিও আধিবিদ্যধারণারই অন্তগত। এতদ্দ্বারা শিবশক্তি জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃতি পুরুষধারণা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে ইহাও আর্য্যদিগের এক অতি আশ্চর্য্য অভিনব জ্ঞানবিভূতি, এমন সুমার্জ্জিত দ্বৈতবিবেক পৃথিবীর কোন অংশের লোকই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই তন্ত্রোক্ত আধিবিদ্য ধারণা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং তজ্জন্যই তাহা অতি নিপুণতার সহিত মূর্ত্তিযন্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অবশ্য ঈশ্বরজ্ঞান আবার মর্ত্তিতে রক্ষিত হইতে পারে, এই কথা অন্যেরা কেনই বিশ্বাস করিবেন। অথচ এই দেশে দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় সাধকগণ মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি সাক্ষাতে রাখিয়া চিণ্ময়ীমাতাই ধ্যান ধারণা এবং মানসিক উপচারে তাঁহার অন্তর্যজন এবং বাহিরেও গন্ধ পুষ্পাদিয়া প্রণিপাত করিতেছেন। অথচ ভাবভক্তি এবং আনন্দ সকলই এর ভিতরদিয়া চলিতেছে। নিশ্চয়ই অন্তরে কোন সংশয় না রাখিয়া এইখানে আর্য্যসন্তানদিগের মনে করিতে হইবে, অকারাদি অক্ষরের মধ্যে যেমন অর্থের সহিত ধ্বনিজ্ঞান রক্ষিত হইয়াছে, অথচ অক্ষররূপে চিত্রগুলি একটীও ধ্বনি নহে, ঠিক তদ্রূপ কালীতারা প্রভৃতি এক একটী মূর্ত্তিতেও মাতৃভাবে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই জ্ঞান সুরক্ষিত এবং তাহা মূর্ত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপেই স্বতন্ত্র জিনিষ। আর এইখানে

ইহাও বুঝিতে হইবে, কালীতারা প্রভৃতি মূর্ত্তির চারি হস্ত লোলজিহ্বা ও গলদ্রুধির বদন প্রভৃতি সকলেরই অতি উন্নত কবিত্বপূর্ণ সুমিষ্ট ভাব আছে। কবিত্বপূর্ণ বলি এই জন্য, তাহা না হইলে ভাবুকের ভাব উথলে না এবং ভক্তিশাস্ত্রেরও দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না। এই কথা যদি কেহ বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে এই স্থানে সুসভ্য খ্রীষ্ট সম্প্রদায়কেও একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাঁহারা যে ঈশ্বর পুত্র যীশুর আলেখ্যে স্বর্গীয় পাখী ও যীশুর মুখমণ্ডল হইতে যেন জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে দেখান, চিত্র সাজান ভিন্ন তাহার অন্য কোন অর্থ আছে কিনা। যদি থাকে তবে কালীতারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যারও বর্ণ এবং ভূষণ বাহন ও প্রত্যেক অঙ্গ ভঙ্গীরই বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে, ইহা মনে করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মকে জগচ্চিত্রে দেখা আর জ্ঞান চিত্রে দেখা একই কথা, ভাবগ্রহণই উভয়ত্র তাহার উপাদেয়তা এবং পরম লাভ। একজন ভাবুক সাধক সঙ্গীতে বলিয়াছেন, "পূজা উপাসনা মা সকলই যে ফাকি। লাভ তাতে এইমাত্র তোমাকে দেখি।" বাস্তবিক তাঁহাকে দেখা এবং তাঁহার ভাব সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়াই জীবের পরমানন্দের বিষয়।

যাহা হউক আর্য্যজাতির চতুর্থ প্রকারের উপাসনা, আধিপ্রজ অর্থাৎ প্রজার মধ্য দিয়া ব্রহ্ম ধারণা। সুসভ্য খ্রীষ্ট সম্প্রদায় এই প্রণালীর অন্তর্ভূত, তাঁহারা ঈশ্বরপুত্র যীশুর

মধ্যেই অতি পরিষ্কৃতরূপে ঐশীশক্তি দর্শন করেন। কিন্তু এইখানে ভারতবর্ষীয় মনীষীদিগের গবেষণা অর্থাৎ তত্ত্বান্বেষণ জ্ঞানীমাত্রেরই একবার তাকাইয়া দেখিবার যোগ্য। তাহাদের এই জীবাবতরণ বার্ত্তা বা অবতার কথন ধর্ম্মজগতের এক অতি গূঢ় রহস্য। যাঁহারা মনোযোগ দিয়া সাধ্রে প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগের অবশ্যই বিদিত আছে, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবীর মৃত্তিকাময় সর্ব্বনিম্নস্তরে মৎস্যের কঙ্কাল ভিন্ন আর কোন জীবচিহ্নই পাওয়া যায় না, সুতরাং ঐস্তর গঠনের সময়কে তাঁহারা মৎস্যযুগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তদূর্দ্ধ দ্বিতীয় স্তরে সরীসৃপ কচ্ছপাদির কঙ্কাল এবং ইহার উপর তৃতীয় স্তরে সগর্ভ পরিস্রাবী স্তন্যজীবী পশ্বাদির পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ এইগুলিই ভবগম্য বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের জীবাবতরণের জন্য পৃথিবীর স্তরে স্তরে এক একটা পদাঙ্ক মানিয়া লইতে হইবে। বাস্তবিক পৃথিবীর জলময় অবস্থায় ঈশ্বর জীবসৃষ্টির ইচ্ছাযোগে সর্ব্বপ্রথম মৎস্যেতেই অবতীর্ণ অর্থাৎ মৎস্যই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টজীব, ইহা এক অখণ্ডনীয় সত্য। তৎপর ক্রমে চরা ভূমি গঠিত হইলে সরীসৃপ কচ্ছপরূপে ও তাহার পর ভূমির পল্বলময় অবস্থায় বর অর্থাৎ মুথা বা মূলমাত্র ভোজী বরাহাদি পশু সৃষ্টিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা আসিয়া কার্য্য করিতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ইতঃপর ঐ পশুযুগ ছাড়াইয়া অবশ্যই

ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টিতে পদার্পণ করেন, ইহাও এক সত্য কথা; এই পরিদৃশ্যমান লীলাক্ষেত্রে ভগবান্ যে মাতৃ কুক্ষিতে প্রোথিত স্ফটিক স্তম্ভবৎ জলপূর্ণ চর্ম্মাপনদ্ধ যন্ত্রটী নির্ভেদ করিয়া নৃসিংহরূপে অর্থাৎ আত্মাতে মনুষ্য ও শরীরগত ভাবে পশু এই দ্বন্দ্বীভূত মনুষ্যের দৃশ্য প্রদর্শন করেন, তাহা বাস্তবিক আস্তিক নাস্তিক সকলেরই দর্শন যোগ্য। ইহাতে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অবিশ্বাসীর নাস্তিকতা বিনাশক ও আস্তিক ভক্ত প্রহ্লাদের ভক্তি বৃদ্ধি-কর পৌরাণিক বর্ণনা অতি মিষ্ট অথচ ইহা এক সর্ব্বজনদৃশ্য প্রত্যক্ষ সত্যমূলক ঘটনা।

যাহা হউক অতঃপর ঐ শিশুর উপনয়ন বা জ্ঞান জন্ম না হইয়াছে পর্য্যন্ত অবশ্যই সে বামন অর্থাৎ অপূর্ণ বা অনুন্নত মনুষ্য। এইখানে বাস্তবিকই পাতালস্থিত বলি-রাজকে ছলনা করিয়া বালক ত্রিপদভূমির অধিকার গ্রহণ করে। সকলে মনে করিয়া দেখুন, মায়া মোহাচ্ছন্ন সন্তান-বৎসলেরা মস্তকে পা দিয়াই শিশু শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্বাধীনভাবে আরূঢ় হইবার শক্তিলাভ করিতেছে। বাস্তবিক এই স্থানে মাতা পিতার মধ্যদিয়া ভগবান্ কেমন ছল চাতুরী খেলিতেছেন, তাঁহারা কেমন অক্লেশে শিশুর মল মূত্র ধৌত ও লালনপালন করিয়া শারীরিক পরিপুষ্টি সাধন ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়া মানসিক উন্নতি বিধান এবং ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া আধ্যাত্মিক জীবনেও

আরূঢ় করাইয়া দিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহাই বামনের ত্রিপদ ভূমি লাভ।

ইহার পর অবশ্যই উন্নত মানুষীয় ভাবে ভগবদিচ্ছার অবতরণ দেখিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। এই স্থানে বাস্তবিকই আর্য্য জাতির জাতীয় জীবনে অভিনীত চারিটী বর্ণ ধর্ম্ম ও চারিটী আশ্রম ধর্ম্মের আভাস অর্থাৎ চিহ্ন লইয়া চারিজন অবতীর্ণ। তন্মধ্যে একজন দণ্ডকমণ্ডলু ও তৃণ চর্ম্ম পরিহিত উন্নত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী ও বিপ্রধর্ম্মী পরশুরাম। দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়বেশ ধনুর্ব্বাণ হস্তে অবতীর্ণ—পুরুষোত্তম শ্রীরাম। ইনি আবার ফলমূল আহার ও জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক মুনিবেশে বাণপ্রস্থ্য ধর্ম্মের ও সম্মান দেখাইয়া গেলেন। তৎপর বৈশ্যবৃত্তির প্রধান যন্ত্র লাঙ্গল ধ্বজ করিয়া অবতীর্ণ বলরাম। ইনি এক দিকে লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া যেমন বৈশ্যোচিত বর্ণ ধর্ম্মের সম্মান দেখাইলেন, আবার জীবনের অভিনয়ে ছাপ্পান্ন কোটি যাদব কোলাহলের অগ্রণী হইয়া গার্হস্থ্য বিধানে আর একটী আশ্রম ধর্ম্মেরও এক উন্নত একান্নবর্ত্তিতার আদর্শ ভাব প্রদর্শন করিয়া গেলেন। তৎপর জগতের সেবাব্রত লইয়া চতুর্থ বর্ণ-ধর্ম্ম অভিনয় করিয়া দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ বুদ্ধদেব। ইনিও কিন্তু আবার জীবনের সমগ্র শক্তি দিয়া সর্ব্বশেষ আশ্রম সন্ন্যাস ধর্ম্মেরই চুড়ান্ত আদর্শ দেখাইয়া যান। বস্তুতঃ শাক্য মুনির মত ত্যাগশীল লোক জগতে অতি বিরল।

ইহারপর সমস্ত বাহ্যপ্রকৃতির নষ্টবিস্তার ব্যক্তিগত ভাবের

প্রাণ জাগতিক ভাবে ও সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য ঈশ্বরের কোনও এক ইচ্ছা কাহারও মধ্যদিয়া ছুটিয়া আসিবে কিনা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই একটু চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আর্য্য মনীষীদিগের ধারণায় সেইটী কল্কি অর্থাৎ নষ্ট সৃষ্টির আত্মকলহ হইতে উদ্ভূত শক্তি। যাহা হউক এই দৃশ্য এবং অদৃশ্য জ্ঞানগর্ভবার্ত্তা ও কবিত্বময়ী ধারণা লইয়াই পৌরাণিক অবতার বর্ণনা ও পরবর্ত্তী ভক্ত জয়দেব প্রভৃতির রসময় গীতকাব্যের সৃষ্টি। এবং তদ্যোগে অদৃশ্য প্রভুরবার্ত্তা পাইয়া ভক্তবৃন্দের অপার আনন্দ। ইহার আসল কথা পৃথিবীর জীবসৃষ্টির মধ্যদিয়া ঈশ্বরের সুসংবাদ গ্রহণ। ইহাই বাস্তবিক আর্য্যজাতির আধিপ্রজ্ঞ উপাসনা বা ব্রহ্মসুসংবাদ।

তাহার পর ভারতবর্ষীয়দিগের পঞ্চমোপাসনা অধ্যাত্ম ভাবনা। এইটী আর্য্যজাতির যোগচর্য্যা; এই স্থানে যোগিগণ যম, নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগাঙ্গ সাধন লইয়া ব্রহ্ম-যোগে আরূঢ় হন। এতদ্বিষয়ের শিক্ষাশাস্ত্র পাতঞ্জল যোগসূত্র। পৃথিবীর মধ্যে ইহা এক অতুলনীয় দর্শন, তাহাতে যোগাঙ্গগুলি এমনি বিশদ ও সুপ্রণালীতে বর্ণিত যে, তাহা জীবনে ধারণ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মযোগ সাধন অতি সহজ হইয়া থাকে।

কোন জীবকেই হিংসা না করা, সত্যব্রত ধারণ করা, পরদ্রব্যের প্রতি লোভ একবারে বর্জ্জন, ভার্য্যাসহ বাস

হইতে বিরতি ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ এই পাঁচটী যম রূপ মহাব্রত, এতদ্বারা অতি উন্নত চরিত্রবল গঠিত হয়।

আর সর্ব্বদা শরীর ও মন পবিত্র রাখা, এবং যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট থাকা, আর তপস্যা অর্থাৎ যথাবিধানে শরীর মন এবং বাক্য পবিত্র করিয়া নিতে যত্ন করা এবং শাস্ত্র পাঠ ও সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা এই পাঁচটী নিয়ম সাধন দ্বারা আভ্যন্তরিক চরিত্র গঠন করিতে হয়।

এইরূপ আসন প্রাণায়াম প্রভৃতির ও প্রণালী এবং তাহার উপকারিতা পাতঞ্জলসূত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক জীবন দেবভাবে গঠিত ও পবিত্র করিয়া লইতে হইলে এবং সশরীরে ব্রহ্মসান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে এই যোগপথে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। ইহাই জীবের মোক্ষ ধামে যাইবার প্রশস্ত পথ।

তাহার পর একটু স্থিরচিত্তে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, পূর্ব্বোক্ত চারিটী উপাসনাতেই অন্যাপেক্ষা অর্থাৎ অন্যের মধ্যবর্ত্তিতা থাকে, ইহাতে তাহা একেবারেই নাই, এই উপক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয় দূরে সরাইয়া একমাত্র ব্রহ্মকেই একাগ্রচিত্তে ধারণ করা হয়, বস্তুতঃ ইহারই নাম সমাধি এবং ব্রহ্মযোগ।

এক্ষণে সকলে অবধারণ করিয়া দেখুন, আর্য্যজাতির এই পঞ্চোপাসনার বাহিরে পৃথিবীতে আর কোন উপাসনাই নাই। তাহার পর আর একটী অতি আনন্দের কথা এই

শান্তি উপলক্ষ করিয়াই হউক কিংবা অগ্নিচক্রে অথবা দাম্পত্য দর্পণের ভিতর দিয়াই হউক, আর জীবসৃষ্টি ধরিয়াই হউক, কিংবা যোগমার্গে দাঁড়াইয়া সর্ব্বত্র একই দেবের পাত্র গ্রহণ করা হইতেছে। কেবল একটু প্রভেদ এই, যেখানে শরীরগত যোগ বা শারীরিক কল্যাণ সাধিত হয়, তথায় ব্রহ্মের কার্য্যের ভিতর দিয়াই ভক্তি কৃতজ্ঞতা ও সমাদর প্রকাশ করিতে বাধ্য হওয়া যায়। লৌকিক ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়; কোথাও কোন রাজদূত রাজানুগ্রহ বা রাজ প্রসাদ বহন করিয়া আনিয়া দিলে সেই রাজদূতকেই যথা-যোগ্য অভিবাদন এবং সম্মানকরা সর্ব্বস্থানের শিষ্টাচার। সমাজেও প্রায় তাহাই প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরপূজা শাস্ত্র এই নীতিতেই পূজিত। আর বৈদিক সময়ের ও ধর্মনীতিতে প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, বিশ্বপালক পরমেশ্বর যেখানে যে মঙ্গলবিধানের জন্য যে শক্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম দিতে ব্যবস্থা রহিয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, আর্য্য-জাতির এই জন্মাচারে সূর্য্যার্ঘ্য ও সূর্য্যাভিবাদন সেই ব্রহ্মেরই একটী বিশিষ্ট মঙ্গল প্রবর্ত্তনার সমুচিত সমাদর।

যাহা হউক সূর্য্যার্ঘ্যের পর আর্য্যনারীগণের ভর্ত্তা তাহাকে সাদরে করদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিয়া থাকেন, "হে বিষ্ণু অর্থাৎ বিশ্বের আপ্যায়িতা পরমেশ্বর তোমাকে সন্তানোৎপাদন করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং

সে ত্বষ্টা অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মা ঈশ্বর তোমার সৌন্দর্য্য গড়াইয়াছেন এবং প্রজাকাম হইয়া শক্তি সিঞ্চন করিতেছেন, সেই বিধাতা তোমাকে পুত্র প্রদান করুন।"

তাহার পর অমারূপা ঘোর তমোময়ী বিশ্ববিকাশের মূলীভূতা শক্তিকে ভগবতী সিনীবালী নামে অভিহিত করিয়া বলা হয়, 'হে ভগবতী সিনীবালি! এই বধূকে গর্ভধারণ করাও। হে সরস্বতি! (হে বিশ্বরসবাহিনি!) তুমি ইহার গর্ভ অর্থাৎ শুক্র শোণিতময় গর্ভরস পোষণ কর। আর হে পদ্মমালিন্ অশ্বিনীকুমার! হে দীপ্তিময় দেবগণ! তোমরাও ইহাকে গর্ভধারণে প্রবর্ত্তিত কর।" এইখানে অশ্বিনীকুমার গর্ভধর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি আর দেবতা বিশ্বপ্রবর্ত্তিকা নিখিল প্রকৃতি।

তৎপর ভর্ত্তা সেই বালাবধূর নাভিদেশে অর্থাৎ মণাধারে সর্ব্বরত্নের সার স্বর্ণ যোজন করিয়া অতি মধুর বাক্য বলিয়া থাকেন, "হে কল্যাণি! তুমি নির্ব্বিঘ্নে গর্ভধারণ করিয়া জীবিত পুত্র প্রসব করিবে। পুত্র প্রসবের জন্যই তুমি অত্যন্ত কল্যাণবতী।"

তাহার পর শুধু হস্তদ্বারা নাভিপদ্মটী ধারণ করিয়া বলিয়া থাকেন, "হে সুব্রতে! তুমি দীর্ঘায়ু বংশধর পুত্র প্রসব করিবে। অর্থাৎ যে পুত্র বংশ উজ্জ্বল করে এমন পুত্র প্রসব করিবে। এইখানে "সুব্রতে" এই শব্দটীর ভিতরে কি যে সুমিষ্ট ভাব সন্নিবেশিত, তাহা কথায় ব্যক্ত

করা যায় না। এই স্থলে প্রিয় জীবন সহচরের বংশ প্রবর্ত্তিত করিয়া দেওয়াই আর্য্যনারীর ব্রত বুঝিতে হইবে। ইহার পর শোণিত পঞ্চগব্য সাদরে বধূকে সেবন করাইয়া তদায় দেহ যন্ত্রটী পবিত্র ও তেজঃসম্পন্ন করা হয়।

অবশ্যই এই খানে আর ব্যাখ্যা করিয়া বোঝাইতে হইবে না যে, আর্য্য-কুমারী রজোবতী হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে সৎপাত্রে গচ্ছিত করিয়া রাখিবার জন্য আর্য্যেরা কেন শাস্ত্রে এত পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। বাস্তবিক পুত্রোৎপাদনের মূলে এই পিতৃপূজা এবং সৃষ্টিপ্রবর্ত্তনার মূলদেবতা সম্যানমস্কার ও সৃষ্টিকারিণী অদৃশ্য ঐশীশক্তির নিকট প্রার্থনারূপ সৎক্রিয়া না থাকিলে নিশ্চয়ই ইহা এক পশুবৎ মিলন ও পশুর ন্যায় সন্তানোৎপাদন করা হয়।

ইহার পর আবার যথাকালে ঐ সংস্কৃতা বালাবধূ গর্ভধারণ করিলে সেই বংশলোপ ও ঈশ্বরদত্ত মহারত্নের প্রতি সমাদর প্রদর্শনার্থ পুংসবন ও সাধভক্ষণ সহ সীমন্তোন্নয়ন নামে দুইটী সংস্কার হইয়া থাকে। পুংসবন নির্ব্বিঘ্নে গর্ভ-ধারণার্থ পৌর্শিত অস্ফুট বটপত্র মুকুলের রসাঘ্রাণরূপ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার সহিত মঙ্গলাচরণ। আর সীমন্তোন্নয়ন গর্ভপাত্র সংস্কার। বস্তুতঃ সন্তানকে মাতৃজঠর হইতে এত আদর ও অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিতে আর কোন জাতিকেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহার পর সন্তান উপজাত হইলে আবার তদীয়

জন্মোৎসব আর একটী অতি আনন্দজনক ব্যাপার। এই উপক্রমে নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বেই পিতৃপূজা করিয়া প্রথমতঃ উত্তমরূপে পেশিত ব্রীহি ও যবমার্জ্জন করিয়া শিশুর জিহ্বাটী পরিষ্কার করা হয় এবং তৎপর সঘৃত সুবর্ণ দ্বারা মেধাশক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত অতি সুমিষ্ট ভাবপূর্ণ মন্ত্রযোগে জাত সন্তানের জিহ্বা পরিমার্জ্জন করিবার বিধি। এই মন্ত্রে মিত্রাবরুণ এবং অগ্নি ও অশ্বিনাকুমার দেবতা। মিত্র দিবাজ্যোতি আর বরুণ রাত্রি দেবতা, অগ্নি পার্থিব কল্যাণ সাধনে প্রবর্ত্তিত জ্যোতি এবং অশ্বিনীকুমার ওষধিজ্যোতিঃ বা তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা। এই চারিটী শক্তিই স্বর্ণ আর ঘৃতে বিদ্যমান। স্বর্ণ বহুসার এক তেজঃপুঞ্জ পদার্থ, ইহা সেবন করিলে শরীরে কিরূপ তেজ বৃদ্ধি হয়, তাহা সকলেই জানেন, আর ঘৃত প্রাণি জাত হইলেও ইহা ওষধিসার এক মহোপকারী বস্তু। এইখানে এই নবজাত শিশুর রসনাতে অপর কোন বস্তু স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে তদীয় রসবাহী সুসূক্ষ্ম শিরাগুলি ঐ দুইটী সম্মিলিত বস্তুর প্রক্রিয়া দ্বারা কোন শক্তি সম্পন্ন হয় কিনা, তাহা বিজ্ঞানরস ভাবনা চতুর পণ্ডিত বর্গেরই বিশেষ বিবেচ্য। যাহা হউক এই সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার সামর্থ্য থাকিলে যথাশক্তি দানাদি সৎক্রিয়া ও ইষ্টমিত্রকে দধি মৎস্য এবং মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। আর অনেক স্থলেই ইষ্টমিত্রের নিকট এই জন্মের সুসংবাদবাদী ভৃত্যগণ পুরস্কৃত হইয়া থাকে।

ইহার পর ঐ জাত শিশুর আর একটী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নিষ্ক্রমণ। জন্মের তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণেই কুমারকে অতি আনন্দজনক বাদ্যোদ্যমের সহিত আদরাতিশয়ে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া পরিষ্কৃত মঙ্গল বারিতে স্নান করান হয়। তৎপর সায়ংকালে রাক্ষসী বেলা অতিক্রম করিয়া পিতা বদ্ধাঞ্জলিমুখ চন্দ্রাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলে মাতাও শিশুটীকে পরিষ্কৃত মনোজ্ঞ বস্ত্রে আবৃত করিয়া বাড়ীর দক্ষিণদিকে ভর্ত্তার বামপার্শ্বে দণ্ডায়মানা হন এবং কুমারকে অত্যাদরে ভর্তৃক্রোড়ে অর্পণ করেন। তখন পিতা সাদরে অমৃতকিরণ চন্দ্রমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন, "হে চন্দ্র। তোমার অন্তর্ভূত সুসীম অর্থাৎ অতি শীতল যে প্রজা পোষণ শক্তি, তাহাতে নিহিত যে হৃদয় অর্থাৎ জীবন্ত ইচ্ছাময় ভাব, তাহা ব্রহ্ম বলিয়াই আমি জানি, অতএবই আমার এই পুত্র সম্বন্ধীয় কোন বিঘ্ন কখনও প্রাপ্ত হইব না।"

আর "পৃথিবীতে যাহা অনামৃত অর্থাৎ মৃত্যুবিরোধী তাহা দ্যুলোকে চন্দ্রমাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাতেই অমৃতের নাম আমরা জানি, অতএবই আমি মন্যমান করি, আমি পুত্র সম্বন্ধীয় কোন বিপদ প্রাপ্ত হইব না। অর্থাৎ তোমার অমৃতই রক্ষা করিবে।"

তাহার পর ইন্দ্র এবং অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে, "হে ইন্দ্রাগ্নি! যেহেতু তোমরা প্রজাপতি অর্থাৎ প্রজাপোষণ কার্য্যে নিযুক্ত, অতএবই তোমরা আমার এই

সন্তানটিকে এইরূপ কল্যাণ প্রদান কর, যাহাতে সে জননী সন্নিধানে থাকিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়।"

উল্লিখিত এই তিনটী শক্তিই প্রজাপোষণ কার্য্যে নিরত ব্রতা বা ঈশ্বর নিয়োজিত দেবতা। সুতরাং ইহাদের গুণ বর্ণন বা ইহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যন্তই এক জ্ঞানগর্ভ প্রবর্ত্তনা। পিতা ইহার পর কুমারকে চন্দ্র দর্শন করাইয়া অর্ঘ্যদ্বারা চন্দ্রকে সমাদৃত করেন। তৎপর পিতা কুমারকে মাতার ক্রোড়ে দিয়া বাম দিক্ যাগান পূর্ব্বক শান্ত্যাদি সিঞ্চন করিলে মাতা মঙ্গলাচরণসহ শিশুকে নিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। ইহা অবশ্যই আর্য্যজাতির এক অতি উৎকৃষ্ট প্রবর্ত্তনা যে, আর্য্য শিশুরা ঈশ্বরের সৃষ্টি দর্শন করিতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বাদৌ সৃষ্টির সর্ব্বসুন্দর বস্তুটী দর্শন করিয়া থাকে। অথচ যিনি চন্দ্র দর্শন করাইতেছেন, তিনি চন্দ্রের প্রজাপোষণ শক্তিতে সারভূতরূপে ব্রহ্মপদার্থকেই দেখিতে পান।

ইহার পর শিশুর আর একটী সংস্কার নামকরণ। ইহাতেও অগ্রে স্বর্গবাসী পিতৃলোকের পূজা ও সমস্তদেবগণকে আহুতিদ্বারা সুপ্রসন্ন অর্থাৎ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট করিয়া পিতা শিশুর মুখ নাসিকা নেত্র ও শ্রোত্র স্পর্শ করিতে করিতে শিশুকে অভিমত সুন্দর নামে অভিহিত করিয়া বলিয়া থাকেন—"হে, দেবদত্ত! তুমি কে, এবং তুমি কোন জাতীয়? এই কি তুমি? তুমি কি অমৃত অর্থাৎ অমরণশীল? এই যে তুমি দিবসের

আহ্নিক মানে প্রবেশ করিতেছ। অহঃ আবার তোমাকে রাত্রির জন্য গ্রহণ করিতেছে—অর্থাৎ রাত্রিতে নিয়া প্রবেশ করাইতেছে। রাত্রি আবার অন্য অহোরাত্রের জন্য, ও অহোরাত্র পক্ষের নিমিত্ত, পক্ষ মাসের জন্য, মাস ঋতুর জন্য ঋতু সম্বৎসরের জন্য এবং সম্বসর আয়ু 'অর্থাৎ সমগ্র জীবন এবং জরার জন্য গ্রহণ করিতেছে।" অর্থাৎ একটা সুশৃঙ্খল পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়া চলিয়াছ মাত্র ; কোথাও তোমার নাশ সাধিত হইতেছে না।

তৎপর পিতা কুমারের মাতাকে বলিয়া থাকেন—"তোমার পুত্রের এই নাম করণ হইল।" এবং কুমারের দক্ষিণ কর্ণে বলিয়া থাকেন, "তুমি এই নামে অভিহিত হইলে।" অবশ্যই ধ্বনি রক্ষার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পরে এই শিশুর কর্ণপথে নাম ধ্বনি যে একটা বিফল প্রযত্ন নয়, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না।*

তাহার পর আর্য্যশিশুর আর একটা সংস্কার অন্ন-প্রাশন। ইহাতেও পিতৃপূজা এবং দেব যজন করিয়া পিতা একটা মন্ত্র যোগে শিশুর মুখে অন্ন প্রদান করিয়া থাকেন। সেই মন্ত্রটার অর্থ এই—'হে অন্নপতি সূর্য্য, তুমি অনমীর অর্থাৎ আরোগ্য প্রদ এবং শুষ্মী অর্থাৎ অগ্নি বৃদ্ধি কর 'অন্নের শক্তি বিধান করিতেছ, এবং অন্নদাতা যিনি, তাহাকে প্রকাশ করিতেছ ;

* ইহা অনেকেই জানেন, অধুনা একপ্রকার যন্ত্রের মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে ধ্বনি রক্ষিত হইতেছে।

আর আমাদিগের মধ্যে যাহারা দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ সকলেরই সুখ বিধান করিতেছ।"

ইহার পর মস্তকে শিখা ধারণের জন্য চূড়া ও কর্ণে স্বর্ণধারণের নিমিত্ত কর্ণবেধ নামে দুইটী অনুষ্ঠান সহ আর্য্য-শিশুর উপনয়ন আর একটা সংস্কার। এই খানে আর্য্য সন্তান দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক বেদ শিক্ষা ও বৈদিক আচারে প্রবৃত্ত হয়েন। বস্তুতঃ মনুষ্য-শিশুর এমন দীক্ষা ও এমন শিক্ষা-প্রবর্ত্তনা পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য কথা নয়, আট বৎসরের শিশু ব্রতধারী হইয়া দিবসে তিনবার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করে এবং বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত। উপনয়নে উপবীত সহ সাবিত্রী গ্রহণ, বেদারম্ভ ও সমাবর্ত্তন এই তিনটী প্রসিদ্ধ ক্রিয়া। উপবীতকে যজ্ঞসূত্র ও বলে, ইহা ত্রিদণ্ড ধারণের অর্থাৎ কায়মন এবং বাক্য এই তিনের সংযমরূপ ব্রতগ্রহণের চিহ্নস্বরূপ। উপবীত গলে ধারণ করিলেই বুঝিতে হইবে, ইনি শরীর মন ও বাক্য এই তিনটী পরিশুদ্ধ করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সময়ে কোন ভাগ্যবান্ এই ব্রতসাধন করিয়া উঠিতে পারিলে উপবীত যজ্ঞে আহুতি দিয়া পরমহংস ব্রতগ্রহণ করেন। আর সাবিত্রী বেদমাতা গায়ত্রী। তৎপরে বেদারম্ভে ঋগ্‌বেদাধিপতি অগ্নি, যজুর্বেদাধিপতি বায়ু, সামবেদাধিপতি সূর্য্য ও অথর্ব্ব-বেদাধিপতি চন্দ্রমা, এই চারিটী শক্তির মহিমাব্যঞ্জক চারিটী মন্ত্র আচার্য্য শিষ্যকে পাঠ করাইয়া থাকেন। ইহার পর

গুরুর অনুজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মচারীর গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করার নাম সমাবর্ত্তন। অবশ্যই অধুনা সাধারণ গৃহস্থ বালকগণের পক্ষে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া থাকা আর হয় না। এক বৎসর মাত্র সময় এই ব্রত নিয়া উদ্‌যাপন করা হয়। যাহা হউক অতঃপর পুত্রকে দারপরিগ্রহ করাইয়া গৃহধর্ম্মে সংস্থাপিত করা পর্য্যন্তই আর্য্যজাতির সন্তান প্রবর্ত্তনা মনে করিতে হইবে।

আদ্যা বামাসুন্দরীও এই সুমিষ্ট জ্ঞানগর্ভ প্রবর্ত্তনার মধ্য-দিয়াই কয়টী পুত্রকন্যাসহ—জীবন পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর সংসারক্ষেত্র হইতে ইহার পুত্রকন্যারা কে কিরূপভাবে পরিচালিত, তাহাই সংক্ষেপে আমি এই স্থানে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। অবশ্য সকল মাতারই সন্তান মাতৃ-ক্রোড়ের অলঙ্কার এবং জীবনের আশ্চর্য্য শোভা। তথাপি বামাসুন্দরী এইক্ষেত্রে যেরূপ দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া গেলেন, তাহা এইস্থানে উল্লেখ যোগ্য।

শিলচরে আসিবার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কয়টী পুত্রকন্যা হয় এবং দম্পতির জীবনের স্রোত এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাপথ দিয়াই বিশেষরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাদের শিক্ষা ইহাদের লালন পালন ও অঙ্গসৌষ্টব সাধনই এই সময়ে পতি পত্নীর জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠে। প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠা দুইটী কন্যার শিক্ষা নিয়াই পিতা ব্যস্ত, কিরূপে ইহাদের "লেখাপড়া শিক্ষা ও চরিত্রগঠন হইবে,

তাহার জন্য ইনি সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতেন এবং অল্পদিন মধ্যেই বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে তথায় একটী বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া স্বয়ংই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শিলচরে এই প্রথম বালিকা শিক্ষার জন্য যত্ন ও বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হয়। ইহার প্রিয়তমা জীবন সহচরীও অতি আদরের সহিতই স্বীয় প্রেমাস্পদ কন্যা দুইটীকে প্রতিরোজ প্রাতে কিছু আহার করাইয়া ও কেশ বিন্যাস করিয়া দিয়া নিত্য নিত্য বিদ্যালয়ে যাইয়া পড়া শুনা করিতে উন্মুখ করিয়া দিতেন। ভাল হউক আর মন্দই হউক ইহাদের এই মধ্য জীবন পুত্র কন্যাদের জন্যই খাটিতে খাটিতে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই স্থানে ইহা নিতান্তই এক সুখের বার্ত্তা যে, এই প্রণয়ীদম্পতির কন্যা দুইটী ক্রমেই সুশিক্ষিতা হইয়া পিতা মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন; মেয়ে দুইটী দেখিতে যেমন সুশ্রী ও লাবণ্যযুক্তা, চরিত্র আবার তাহা হইতেও মনোজ্ঞ ছিল। একদা জর্ম্মাণদেশীয় একজন পাদ্রি সাহেব ও তদীয় সহধর্ম্মিণী বিদ্যালয়ে মেয়ে দুইটীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ তাহারা যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ইহা জানিয়া আরও অধিকতর আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

বড মেয়েটী অগ্রে বাঙ্গালা পড়িয়া শেষে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার নক্সওয়াইট ও আসামীয় শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার

উইল্‌সন সাহেব বাহাদুর এক যোগে এই বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া মন্তব্যে লিখিয়া যান, "এই বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর বালিকাটী তাহার সমবয়স্ক বালকগণ হইতেও অনেক বেশী পরিমাণে কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিল।" তাঁহারা দুইটী জটিল ভগ্নাংশ ও একটী দশমিক অঙ্ক করিতে দিযাছিলেন, এই তিনটী অঙ্কই তিনি অতি সুনিয়মে কষিয়া সাহেবদ্বয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া দেন। তাহারপর ইউরোপের ম্যাপ দেখাইতে আরম্ভ করিলে, সাহেবদ্বয় উপর্য্যুপরি যে কযেকটী কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাও তিনি শান্তভাবে ও নির্ভুলে উত্তর করিয়া এবং ম্যাপ্‌ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহারপর আর একবার মহামতি নক্সওয়াইট বাহাদুর এই বালিকার পিতাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বীয় কন্যা দুইটীকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া যে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, তজ্জন্য এই জেলার লোক চিরদিন আপনার নিকট, কৃতজ্ঞ থাকিবে।" এই প্রসঙ্গে সাহেব সেই জ্যেষ্ঠা বালিকাটীর আরও নানা কথা উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা লিখিয়াছিলেন।'

যাহাহউক তাহারপর ইহাও অত্যন্তই এক গৌরবের বিষয় যে বামাসুন্দরীর এই বড় কন্যাটি কযেক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়া কুমারসম্ভব ও ভট্টিকাব্যেরও কিয়-

স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবী।

দংশ পড়েন। তৎপর ব্যাকরণে ও সাহিত্যে একটু প্রবেশাধিকার হইলে চণ্ডী, বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড, মহাভারত বনপর্ব্ব ও শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পিতৃদেব ও সুশিক্ষিত সংস্কৃতানুরাগী স্বামীর প্রবর্ত্তনায় এতদ্দ্বারা ইনি পুরাণ বিষয়ে সংস্কৃত উপাধির পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই সময়ে ইনি পিতা মাতার সঙ্গে গৌহাটী অবস্থান করেন এবং পিতামাতার ধর্ম্মকর্ম্ম ও যাবতীয় সদ্ভাবের স্রোতানুযায়ী নিয়ত পরিচালিত হইতেছিলেন। প্রতিদিন প্রাতে পিতার ধর্ম্মকুঠরীতে পিতৃদেবের প্রাতঃকৃত্যের পর গীতা পাঠ শ্রবণ ও তদনন্তর পিতা মাতার পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া সেই কুঠরীতেই ১০টা পর্য্যন্ত পিতৃসন্নিধানে বসিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেন।

ঐ বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে পিতা স্বদেশে প্রস্থান করিলে বামাসুন্দরীর সেই বিদ্যাপরা বিদুষী কন্যার গুণবান স্বামী পুঁঠিয়া হাই স্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার সদাত্মা শরচ্চন্দ্র চৌধুরী আসিয়া কিছুদিন গৌহাটীতে পত্নীসহ অবস্থান করেন এবং যথাসময়ে আবার পুঁঠিয়ায় যাইয়া শ্বশুর মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত যে কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে সহজেই প্রতীতি হইবে, এই বালিকার মাতা কেমন এক বহুমতী ছিলেন।

৭ই আষাঢ় ১২৯৫,

পুঁঠিয়া।

দেব! গত কল্য মাতাঠাকুরাণীর বষ্ঠীর আশীর্ব্বাদ এবং অদ্য আপনার অমৃতস্পর্শী পত্রখানি পাইয়া অপার আনন্দলাভ করিলাম। আমার উত্থাম আত্মা আপনাদের পরিবার-সংসৃষ্ট হওয়া ধন্য হইয়াছে। যে হৃদয় মরুভূমী ছিল, আজ তাহাতে স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিনী প্রবাহিত হইতেছে। আমি আজ জগৎকে অমিশ্র সুখপূর্ণ দেখিতেছি। যিনি এইরূপ সুখের বিধানকর্ত্তা, বোধ হয়, পাষাণ হৃদয়ও তাঁহার প্রেতি-ভক্তিতে আনত এবং প্রেমে বিগলিত হয়। আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন সর্ব্বাংশে আপনার সুশীলা দেবোপমা মুক্তকেশীর উপযুক্ত হইতে পারি। আপনাদের লোকোত্তম স্নেহ যত্নের ছায়ায় থাকিয়া তাহার চরিত্রের অতলস্পর্শ পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল স্বর্গীয় বৃত্তি ক্রমে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, আমি যেন চিরদিন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকি।

ইতি—আপনার স্নেহের

শ্রীশরৎ।”

ইহারই কয়েক দিন পূর্ব্বে বামাসুন্দরী তাঁহার সুকৃতির সংসারস্বরূপ পতি পুত্র সঙ্গে গৌহাটীর সন্নিহিত কয়েকটী তীর্থ ভ্রমণ করেন। তন্মধ্যে তাঁহার কামাখ্যেশ্বরী দর্শনার্থ নীলাচলপর্ব্বতারোহণ ব্যাপারটী বড়ই সুন্দর। মুক্তকেশীর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে, “সর্ব্বাগ্রে পাণ্ডাঠাকুর, তৎপর

শ্রীমান শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি এ।

চারুপ্রভাকে কোলে করিয়া একজন ভৃত্য ও সুরেন্দ্রনাথ, তাহারপর মুক্তকেশী ও তদ্ভগিনী স্বর্ণপ্রভা, তৎপশ্চাৎ যতীন্দ্রনাথকে কোলে করিয়া মাতাঠাকুরাণী ও সর্ব্বশেষে বসনপ্রিয় হরিভক্ত যোগেন্দ্রনাথকে হস্তে ধারণ করিয়া মুক্ত-কেশীর পিতা উঠিতে থাকেন। এই দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর ও ভাবময়. সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, মন উৎসাহিত ও অঙ্গ পরিষ্কৃত বসনে শোভিত; বোধ হয় যেন ইঁহারা কো. সুকৃতির ফলে সপরিবারে স্বর্গারোহণ করিতেছেন।"

এই তীর্থভ্রমণ হইতে আসিয়া বামাসুন্দরীর বিদ্যোৎসাহিনী কন্যা মুক্তকেশী আবার—অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করেন। সামান্য কথা নয়, সমস্ত দিন পড়াশুনা করিয়াও রাত্রি একটার পূর্ব্বে প্রায় কোনদিনই তিনি শয়ন করেন নাই। ইঁহার এই বিদ্যানুরাগ ও পরিশ্রমের আধিক্য দেখিয়া মাতা প্রায় সর্ব্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেন এবং বলিতেন, ওগো অতিশয় কোন কার্য্যই ভাল নয়। এই সময়ে স্বামীও পরিশ্রমের মাত্রা একটু লঘুতর করি-বার জন্য পুঁটিয়া হইতে পত্নীকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। তদুত্তরে সেই বিদ্যাপ্রিয়া গুণবতী ভার্য্যা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও এই সময়ে পরিশ্রমের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া সুরক্ত প্রিয় জীবনসহচরকে আশ্বস্ত করেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলা. তাহা অনেক সময়েই বুঝিয়া লইতে পারা যায় না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এত আশা—এত যত্ন

ও এত বিদ্যানুরাগ ব্যর্থ করিয়া বিধাতা অকস্মাৎ বামাসুন্দরীর এই জীবন, শোভা কন্যারত্নটীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। বিপদ আপদ অবশ্য সকলেরই আছে, কিন্তু এই ঘটনাটীতে এই পরিবারের কি যে একটী সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝান অসাধ্য। এই সুশোভনা বিদ্যাবতী সপ্তাহকাল ওলাউঠা রোগে ভুগিয়া একটী পুণ্যদিনে প্রস্থানোন্মুখী হইলে তখন আর কি, তৎকালে যতদূর সম্ভব পুণ্যপ্রবর্ত্তনা দিয়া স্বর্গের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই সজ্জনদিগের কর্ত্তব্য। সেই দেবীতনু মৃত্যুশয্যায় শায়িতা হইলে পিতা মাতা এবং পুঠিয়া হইতে সমন্যস্ত আগত বিদুষীর প্রেমমোহিত দেবাত্মা স্বামী ও তাঁহার অত্যন্ত স্নেহকারী ঠাকুরদাদা গৌহাটী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাত্মা অভয়বাবু প্রভৃতি সুহৃদগণ চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসেন। শিরঃস্থানে গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী ও বিষ্ণুপুরাণ সংরক্ষিত করিয়া পিতা উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হন। মাতা অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে তুলসীপত্রযোগে বিন্দু বিন্দু করিয়া মুখে তীর্থবারি প্রদান করিতে থাকেন। এইপ্রকারে সেই তীর্থময় প্রদেশে মহাগুরু স্বামী, জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা এবং বিপ্রগণের মধ্য হইতে ঐ ভাগ্যবতী তনু ত্যাগ করিয়া যান।

তৎপর মুক্তকেশীর পিতার আদেশক্রমে গৌহাটী

স্কুলের ছাত্রগণ রাশীকৃত পুষ্প ও পুষ্পমালা আনিয়া উপস্থিত করিলে সেই স্বর্গগতাসতীর শুদ্ধতনু বিপ্রগণ বাহিত পুষ্পমালাশোভিত অতি সুন্দর দোলায় করিয়া গোহাটীর দক্ষিণে ভরলুনদীর তীরে একটী কদম্ব মূলে নিয়া দাহ করা হয়। অহো! এই ভাগ্যবতী পিতামাতা ও স্বামী এই তিনেরই কেমন এক সুকৃতি পতাকা ছিলেন। বিশেষতঃ এই মৃত্যুতে তাঁহার সদাত্মা স্বামীর পক্ষে কি যে এক অসাধারণ ক্ষতি হইয়া গেল, তাহা সঙ্কলনমাত্রেই অনুভবনীয়। অতঃপর এই সদাত্মা আর দারপরিগ্রহ না করিয়া যতিবেশে ও পরমার্থ চিন্তনেই জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন। অবশ্যই বলিতে হইবে ভারতের সতীকুলের বৈধব্য ব্রতের ন্যায় এই এক-পত্নী-ব্রত অত্যন্তই এক সদৃষ্টান্ত।

এই দিকে ঐ দুহিতৃবৎসল পিতামাতাও আর তথায় অধিক দিন না থাকিয়া আবারই পূর্ব্বস্থান শিলচরে চলিয়া আইসেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি বিচিত্র বিধান ইঁহাদের সেই প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তাঁহারা ষ্টীমারযোগে গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারী যুবক কলিকাতা হইতে একটী একতারা বাদ্য যন্ত্র হস্তে করিয়া সায়ংকালে তীর সংলগ্ন আসামীয় ষ্টীমারমধ্যে আসিয়া দর্শন দেন এবং তদবস্থাতেই সেই ভগ্ন পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলিত এবং পরিচিত

ছন। তাহারপর ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত এক ষ্টীমারে চলিয়া ইঁহাদের উপর আন্তরিক সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে করিতে আত্মীয়তা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তৎপর বিধাতার নির্ব্বন্ধানুসারে বি-এ, উপাধিধারী এই ধীমান যুবকের সহিতই ইঁহাদের দ্বিতীয় কন্যা স্বর্ণপ্রভার শুভপরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, এই যুবকের সঙ্গিনী হইয়া বামাসুন্দরীর এই কন্যা সাংসারিক ভাবে সুখী হইতে পারেন নাই। বহুদিন প্রতীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ত্যাগই এই যুবকের একমাত্র প্রবর্ত্তনা। ভগবান্ কাহাদ্বারা যে কিরূপ কার্য্য সাধন করাইয়া লইবেন, তাহা জীবের বুঝিবার যো নাই; সম্প্রতি এই ধীমান পুরুষ একজন পূজ্যপাদ পরমহংসের নিকট দীক্ষিত হইয়া যতিবেশে জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছেন।

এই দিকে ইনি তো এইরূপ অন্য দিকে ইঁহার ভার্য্যাটী আবার এমনই সহনশীলা যে পতির এই অতি কঠোর নির্ব্বাণ প্রবর্ত্তনাকেও স্থির ধীর ও অটল হইয়া নীরবে তাঁহার জীবনের একটী ক্ষুদ্র রেখাপাত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। প্রায় ৪ বৎসর হইল বামাসুন্দরীর এই কন্যার দিকে একটী দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঐ বালকটী জন্মিবার পর ঐ যুবক যেন নিবৃত্তিমার্গে আরও একটু বেশী ধাবিত। ইঁহার ইচ্ছা, ইহার ভার্য্যা স্বর্ণপ্রভাও ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। কিন্তু নানাকারণে তাহা আর কার্য্যে

শ্রীশ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী

এবং

পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বি এ।

পরিণত হইতেছে না। সম্প্রতি এই ধর্ম্মমনা পুরুষ গুরুর নির্দ্দেশমতে পূর্ণানন্দব্রহ্মচারী নামে অভিহিত এবং ইনি এইক্ষণে বেশ ধীরে ধীরে যোগপথে আত্ম পরিচালন করিতেছেন। তাহারপর এই সংযুক্তের কেবলই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি তাহা নহে, ইনি কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ও একজন সুশিক্ষিত লোক, সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। আপাততঃ ইনি যোগচর্য্যা এবং পরমার্থ সংগত করিয়াই পুণ্যভূমি ভারতের নানাস্থানে বিচরণ করিতেছেন।

তৎপর বামাসুন্দরীর প্রথম পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ইহার ও পিতৃমাতৃ ভক্তি একটু অসাধারণ। জ্যোতিষাগণনানুসারে দৃষ্ট হয়, এই বালক খুব উৎসাহী ও প্রভাবান্বিত হইবে। জানি না এই গণনার সঙ্গে বা গ্রহনক্ষত্রের সহিত নরভাগ্যের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বাহ্যতঃ যাহা প্রত্যক্ষ হইল, তাহাতে দেখা যায়। এই বালক অতি অল্প বয়সেই পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি দূরগত পঞ্জাবপ্রদেশে যাইয়া কর্ম্মস্থান মনোনীত করে এবং পিতার ঋণ পরিশোধ করিতে প্রয়াসী হয় ও মাতার রুগ্নাবস্থায় বিশেষরূপে অর্থ সাহায্য করে। যাহা হউক ইহার জীবন এখনও সর্ব্বাঙ্গীনরূপে পরিস্ফুট হয় নাই, সুতরাং ইহার সম্বন্ধে এইক্ষণে আর কোন কথা না বলাই সঙ্গত।

তৎপর বামাসুন্দরীর আর একটী কন্যা হিরণ্যপ্রভা;

শ্রাবণী সংক্রান্তি দিবস মাতা এই কন্যাটীকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ কোন ভদ্র পরিবারের মধ্যে অন্যান্য মহিলাগণসহ বসিয়া পদ্মপুরাণ শুনিতেছিলেন। সেই অবস্থায় হিরণ্য হঠাৎ তথা হইতে চলিয়া পিতার নিকট আসিতে চেষ্টা করে কিন্তু পায়ে কাদালাগাতেই বোধ হয়, পা ধুইবার ইচ্ছাতে পুষ্করিণীতে যাইয়া পতিত হয়। তাহার দুই হস্তে দুইটী পিযারা ছিল, তাহা দৃঢ মুষ্টিতে ধরা রাখিয়াই মেয়েটী জলে প্রাণত্যাগ করে। তখন পিতা আপন গৃহে কয়জন ভদ্রলোক সঙ্গে লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন; ঐ শিশুটী অন্যান্য দিবস পিতার পাঠারম্ভ হইলেই তাঁহার কাছে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। মাতা আজও তাহাই মনে করিয়া শশব্যস্তে আসিয়া পূজাতম স্বামী সন্নিধানে হিরণ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্বেষণ আরম্ভ হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পুষ্করিণীতে যাইয়া সেই স্নেহপুত্তলিকার শব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বালিকাটীর শোকে বিশেষতঃ আমাদের অযত্নে ঈশ্বরদত্ত একটী সন্তান নষ্ট হইয়া গেল, এই অপরাধ মনে করিয়া পিতামাতা দুই জনই অনেক দিন পর্য্যন্ত মনো দুঃখে কালযাপন করেন।

ইহারপর দেবীর আর একটী পুত্রসন্তান হয়, এই পুত্রটীর জন্মের পরেই তৎপিতা তাঁহার তৎকালীন ভজনালয় আনন্দ কুটীরে যাইয়া একটু বিশেষ অভিনিবেশের সহিত ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করেন এবং তাহারপর প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে

শ্রীমান সুধেন্দ্রনাথ

আসিয়া বলেন যে, তোমার এই পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ হইবে। অবশ্য অনেক সময়েই আমরা আমাদের এই সহজবুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না যে, মানুষের ভাবিকথা বিশুদ্ধ ধারণায় কিরূপে আসিয়া প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ঐ শিশুর বাল্য জীবনেই সেই সদ্‌গুণ অনেকটা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। এই বালক শিশুকাল হইতেই তাহার পিতাতে অত্যন্ত আসক্ত, তিনিও আদর করিয়া অনেক সময়ে ইহাকে কণ্ঠমণি বলিতেন। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে তিনি তাঁহার আনন্দ কুটীরে যাইয়া বসিলেই সেও পাছে পাছে যাইয়া চুপ করিয়া অতি ধীর ভাবে পিতার ক্রোড়ে চাপিয়া বসিত। এবং অনেক সময়ে মাতা এবং এক অতি আদরের মামার কাছে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া অতি গম্ভীর ভাবে "হরিবল হরিবল হরিবল" এই কথা অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত কীর্ত্তন করিত, আনেকেই অনেক সময়ে কৌতূহলী হইয়া তাহার সেই অভিনিবেশ ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহাতে দৃক্‌পাতও করে নাই, এক এক দিন অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতেও অধিক সময় তাঁহার ঐ ধর্ম্মাভিনিবেশ থাকিত। ইহা ভিন্ন তাহার পাঁচ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই দেখা গিয়াছে ঐ বালক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সাহসী ও আলাপী ছিল। অনেক সময়েই পিতার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়া আলাপ করিত এবং সংস্কৃত নীতিগর্ভ শ্লোক ও ছোট ছোট মিষ্ট বাঙ্গালা কবিতা

মুখে মুখে পিতার নিকট শিক্ষা করিত। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা, এই শিশু তাহার অতি সুন্দর ধর্ম্মভাব প্রণোদিত পবিত্র শৈশব জীবনেই অভিনয় শেষ করিয়া মায়া যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ করিল। যেন একটী স্বর্গীয় দেবদূত পিতা-মাতাকে একটু আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ করিয়া যাইবার জন্যেই আসিয়াছিল।

ইহার পর বামাসুন্দরীর আর একটী কন্যা চারুপ্রভা। এই মেয়েটীরও বিবাহ হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একজন অতি সৎপাত্রের সহিত। ইহার বিবাহের প্রস্তাব ধার্য্য হইলে কন্যা ও বর উভয় পক্ষের নির্দ্ধারণ মতে পিতা মাতা বিবাহের আয়োজন পত্র লইয়া ভৃত্য এবং সমস্ত কন্যা পুত্রসহ নৌকাযোগে প্রীতির সহিত শ্রীহট্ট অভিমুখে প্রস্থানকরেন। অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, মনে সদ্ভাব থাকিলে অধিক ধনজনের কোনও আবশ্যক করে না, নরনারী সর্ব্বকালে আপনার ভাবেই আপনি পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন এবং যেখানে যান, সঙ্গে সঙ্গেই আমোদ প্রমোদ ও ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা চলিতে থাকে। সুতরাং সামান্য বলিয়া কোন দম্পতিরই যে কোন অবস্থায় মনঃক্ষুণ্ণ থাকা কর্ত্তব্য নহে। মাধবীলতা সহকারসহ মিলিতা থাকিলেই তাহার অপূর্ব্ব শোভা ও বনের বিহঙ্গিনী স্বীয় সহচর সঙ্গে স্বাধীন ভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়াই পরম সুখী। ভাবিয়া দেখিলে

শ্রীমতী চারুপ্রভা ও তৎস্বামী
শ্রীমান দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী বি. এ

এই স্বাভাবিক মিষ্টতা ও সুখলাভের উপায় সকলেরই আছে।

যাহা হউক তৎপর ইঁহারা শ্রীহট্ট পৌঁছিলে নির্দ্দিষ্ট দিনেই শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং বামাসুন্দরী এক দিবস তথায় বাবু জয়চন্দ্র ভদ্রের ভবনে নূতন জামাতা এবং স্নেহাস্পদ পুত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একান্ত প্রীতির সহিত ভোজন করান এবং তাঁহাদের সদ্ভাবে অপার আনন্দ অনুভব করেন।

বামাসুন্দরীর এই কন্যাটী শিশুকাল হইতেই গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা; মাতা ইহার গৃহচর্য্যা এবং রন্ধনের সর্ব্বদাই প্রশংসা করিতেন। এই বালিকা ইঁহার পিতার নিকট অবস্থানকালে শঙ্করাচার্য্য বিরচিত গঙ্গার স্তব, শিবস্তোত্র, নির্ব্বাণাষ্টক, অন্নপূর্ণা স্তোত্র প্রভৃতি সংস্কৃত স্তোত্র নিচয় সুস্বরে পাঠ করিয়া পিতাকে অনেক সময়েই আপ্যায়িত করিতেন।

তৎপর বামাসুন্দরী দেবী ৩৪, বৎসর বয়সে গৌহাটী অবস্থানকালে যে একটী পুত্র সন্তান লাভ করেন, তাহার নাম যতীন্দ্রনাথ; এই শিশুটী ক্রোড়ে করিয়াই দেবী কামাখ্যাপীট দর্শন করিতে যান। সপুত্রা জননীর ধীরে ধীরে পাদনিক্ষেপ ও সেই প্রস্তরময়ী সোপাণাবলী আরোহণ বড়ই সুন্দর ব্যাপার। আবার এর সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রান্ত ক্লান্ত ছোট বড় সন্তানদিগকে লইয়া পতিপত্নীর হাস্য

পরিহাস ও আমোদজনক কথাবার্ত্তা আরও মিষ্ট ও সমধিক আনন্দজনক।

কিন্তু সুখ দুঃখ বা হর্ষ বিষাদ কিছুই মানুষের জীবনে চিরদিন সমভাবে থাকে না, দিবারাত্রি বা কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষের ন্যায় সকলই পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া মানুষকে সংসারের অনিত্যতা জীবনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বুঝাইয়া দিতেছে। বিধাতৃ নিরূপিত সময়ে অত্যাদরের পুত্র কন্যা দুইটীকে গৌহাটীতে বিসর্জ্জন দিয়া পতি পত্নী দুই জনেই নিতান্ত মনঃক্ষোভে পূর্ব্বস্থান শিলচরে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সেই অতি গভীর দুঃখের মধ্যেও বিধাতার করুণরস প্রণয় প্রস্রবণরূপে ইঁহাদের হৃদয় খাত দিয়া বহিতে নিবৃত্ত হয় নাই। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুঃখের মধ্যে ভালবাসা বা প্রণয় সাধনই অধিকতর মিষ্ট ও উপাদেয়।

ইঁহারা গৌহাটী হইতে শিলচরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেখানে বাসা প্রস্তুত করেন, তাহারই সংলগ্ন একটী স্থানে স্বর্গীয় মুক্তকেশীর নামে একটী পঞ্চবটী ও একখানা দেবালয় সংস্থাপিত করেন। ইহাই পতির তৎকালে একান্ত আরামের স্থান হইয়াছিল এবং দেখা গিয়াছে ঐ সময়ে পণ্ডিত বনিতা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পতি-সেবায় প্রবৃত্তা হয়েন। প্রত্যূষে উঠিয়াই স্বামী পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক দেবালয় স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়া আত্মকার্য্য করিতেন ও তৎপর গীতা পাঠ

হইত।' এই পুণ্য কথা শ্রবণে 'তৎকালে বামাসুন্দরীরও অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তিনিও অতি নিষ্ঠার সহিত প্রাতঃকৃত্য করিয়া বিনীত ও শান্তভাবে পতিসন্নিধানে বসিয়া তাহা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। এবং পাঠান্তে তাঁহার বিশ্বাস মতে বিষ্ণু প্রণাম করিয়া ভূমিষ্ঠ ভাবে পতিকেও একটী প্রণাম দিয়া সেই পূজ্যপাদ জীবন সহচরের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতেন। অবশ্যই এইরূপ প্রণাম ও পতিসম্মান পুণ্যভূমি ভারত ভিন্ন আর অপর কোন দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক পাঠাবসানে পাত ঘণ্টা বাদন পূর্ব্বক মনের আনন্দ প্রকাশ ও নমস্কার করিয়া সেই দেবালয়েরই দক্ষিণ বারেন্দায় আমলকী বৃক্ষ সন্নিধানে অভিমত কোন এক শাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া বসিতেন। এবং সেই প্রণয়িনী ভার্য্যা তখন অতি সমাদরে নিজ হস্তে চা প্রস্তুত করিয়া অতি প্রফুল্ল মনে একটী পরিষ্কার পাত্রে করিয়া সেই নির্জ্জন বৃক্ষ বাটিকায় আনিয়া পতি হস্তে প্রদান করিতেন। বস্তুটী ভাল হউক বা মন্দই হউক কিন্তু চা সেবনে ইহাদের দুই জনেরই বড় আমোদ ও আনন্দ হইত। বিশেষতঃ সেই ভগ্নাবস্থায় প্রণয়িনীর তাদৃশ মিষ্ট প্রণয় প্রবর্ত্তনা নিশ্চয়ই অত্যন্ত তৃপ্তিকরী ও শান্তিদায়িকা। কোন কোন দিন দেবী একখানা পরিষ্কার থালায় করিয়া আদরাতিশয়ে লুচি, মোহনভোগ, এক বাটী চা, এক গ্লাস পরিষ্কার জল ও তাম্বুল আনিয়া দিতেন। আবার কোন কোন রবিবাসরে

সেই বৃক্ষ বাটিকাতেই রন্ধন ও ছেলে মেয়েসহ কদলীপত্রে করিয়া ইহাদের মধ্যাহ্ন ভোজন হইত। ভারত রমণীর ইহাই অতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যে, তাঁহারা প্রেম ভক্তি মিশাইয়া স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে জানেন।

শিলচরে আসিয়া দুই বৎসর পর বামাসুন্দরী আর একটী কন্যা সন্তান লাভ করেন। এই সন্তানটী জন্ম কোষ হইতে ধর্ম্মবীজ লইয়া জন্মধারণ করিবার অভিপ্রায়ে ইহার জন্মের একমাস পূর্ব্ব হইতেই প্রতিদিন সায়ংকালে জনক জননী স্বীয় বাস ভবনে ভগবদগীতা হইতে অমৃত আহরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম পিপাসা চরিতার্থ করিতেন। তাহার পর হিন্দুজাতির একটী পুণ্যদিনে, যে মহা মহা বারুণী তিথিতে ইহাদের অত্যাদরের কন্যা মুক্তকেশী জন্মগ্রহণ করেন, সেই চিহ্নিত পুণ্যতম দিবসে মাতা পিতা উভয়েই প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক শুচি পবিত্র হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন। এবং দেবালয়টী পুষ্প ও পুষ্পমালাতে সুসজ্জিত এবং ধূপগন্ধে সদ্ভাবাপন্ন করিয়া দুইজনেই ভক্তিভাবে ভগবদর্চ্চনা করেন। তৎপর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়টী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই অধ্যায়ে নমস্কার অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ, নৈমিষারণ্য স্থিত সুত ও প্রাচীন ঋষি শৌনকাদির ধর্ম্মময় আলাপ ভাগবত প্রশংসা ও ভক্ত প্রশংসা অতি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে, যাহা শুনিলে নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মতৃষ্ণা স্বতঃই উজ্জীবিত হইয়া উঠে। যাহা হউক তাহার পর প্রণাম

করিয়া পতি একান্ত আনন্দ ভরে একটী ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাবাদন পূর্ব্বক উভয়ের হৃদয়ে ভগবানের জয় ও তাঁহার পুণ্য যশ ঘোষণা করেন। তদনন্তর দেবীর সন্তানেরা আসিয়া পিতার আদেশ ক্রমে একে একে মাতৃচরণ বন্দনা করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ ফুল, চন্দন, বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ ভোজ্য দিয়া মাতার চরণ পূজা করেন ও তৎপর আবারই ভ্রাতা ভগিনী সকলে অত্যাদরে একে একে মাতাকে প্রণিপাত করেন। ইহার পর দেবালয় হইতে আসিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই দেবী কিছু কিছু বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ন পাচটার পর তিনি স্বামিচরণে প্রণাম করিয়া ধাত্রীসহ প্রসব গৃহে প্রবেশ করেন ও অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে একটী কন্যারত্ন প্রাপ্ত হয়েন। মেয়েটীর জন্ম ভবনে দুইটী সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের পরিবার দুই রাত্রি থাকিয়া প্রসূতিও সন্তানটীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই সমস্ত রাত্রি পরস্পর মধুর আলাপ, নির্দ্দোষ হাস্য পরিহাস ও পুস্তক পাঠ করিয়া অতিবাহিত করেন। তাহার পর শেষদিন অতি প্রত্যূষে ইহারা যে অতি মধুর স্বরে একটী সঙ্গীত গাইয়া প্রভাত মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন; তাহার মাধুর্য্য লেখক এখনও ভুলিতে পারেন নাই। ফলতঃ এই ঈশ্বর নামাঙ্কিত সঙ্গীতটীতে তাঁহাদের প্রসূতি, শুশ্রূষা ও রাত্রিকৃত্যের সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়াছিল।

ইহার পর ৪১ বৎসর বয়সে বামাসুন্দরীর সর্ব্বশেষ কন্যা

অমৃতপ্রভার জন্ম হয়। এই কন্যার জন্মসময়ে 'একজন ইয়ুরোপীয় মিশনারী মেম প্রসূতির বিশেষ সাহায্য ও শুশ্রূষা করেন। এই বিদেশীয়া সম্মানার্হা নারীরত্নের নাম—মিস ষ্টেভন। অবশ্য ইহারা ভদ্রপরিবারে আসিয়া নানা কার্য্য ব্যপদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন বলিয়া সর্ব্বত্রই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারও মূলে একটু সদ্ভাবে দৃষ্টি পরিচালন করিতে অন্তত তাঁহাদের জ্ঞান বিশ্বাসমতে—তাঁহারা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যে নিশ্চয়ই এক অত্যুচ্চ মনুষ্যোচিত সদনুষ্ঠান, এই কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারি না। তদ্ভিন্ন ইহারা যে অনেক সময়েই আমাদের মেয়েদের বিপদের বন্ধু, ইহাও অত্যন্ত এক সত্য কথা। আমরা সর্ব্বদাই দেখিয়া আসিতেছি, একজন বিপদে পড়িয়া ডাকিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কটিবন্ধনপূর্ব্বক সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হন। আর ভাবিয়া দেখিলে নিয়ত পরার্থেই ইহাদের জীবন পরিচালিত, তাঁহারা পরের কথাই সতত ভাবেন ও পরের জন্যই নিয়ত খাটিতেছেন। এমনভাবে নিজের ভাই বন্ধু ছাড়িয়া, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ও অনেকেই নিজের দাম্পত্য ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া জীবনের সমস্ত শক্তি ও সমস্তবল জগতের উপকারার্থ নিয়োজিত করা বড় একটা সহজ কথা নহে। আমার মতে ইহাই যে উত্তম খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার। প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের জন্য জীবন দেওয়াই খ্রীষ্টজীবনের মূল

আদর্শভাব, সুতরাং ইহা জগৎকে শিখাইয়া যাইতে পারিলেই উত্তম খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হইল মনে করিতে হইবে।

যাহাহউক বামাসুন্দরী দেবী ইহাদের ঐ সদ্‌গুণের কথা সর্ব্বদাই স্বামিসন্নিধানে উত্থাপিত করিয়া প্রশংসা করিতেন এবং ধর্ম্মভাবে তাঁহাদের সহিত মিলিতে না পারিলেও তাঁহারা যখন যখন বেড়াইবার জন্য তাঁহার কাছে আসিতেন, তিনি অতি সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতেন এবং হাসিমুখে নানাকথা আলাপ করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট করিয়াদিতেন।

এইতো বামাসুন্দরীর 'সন্তানপ্রবর্ত্তনা' বা সন্তান সৌভাগ্যের কথা শেষ হইল। অধুনা তিনি তাঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা লইয়া স্বর্গরাজ্যে অবস্থিতা আছেন। আর স্বামী তাঁহারই অতি আদরের ছয়টী সন্তান লইয়া মর্ত্ত্যলোকে বাস করিতেছেন। এই স্বর্গমর্ত্ত্যের আদর ও ভালবাসা আরও কতকাল চলিবে তাহা বর্ণনার অযোগ্য।

আর্য্যনারী বামাসুন্দরী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মজীবন।

ধর্ম্মবিষয়ে বামাসুন্দরী দেবী একটু গোঁড়া ছিলেন, ইহা তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীমণ্ডলী সকলেরই নিকট বিদিত। প্রকৃত পক্ষে বলিতে হইবে, ধর্ম্মের জন্য এরূপ গোঁড়ামী বা দৃঢ়তাটুক থাকাই অত্যন্ত আবশ্যকীয়। যে মহার্থ ভূত বস্তুর নিমিত্ত রাজা রাজ্য ছাড়িয়া যান, ধনী অকাতরে ধনরত্ন বিসর্জ্জন দিয়া কৌপীনধারী ভিখারী সাজেন ও যাহার জন্য মহাত্মা পুরুষেরা পুত্র-শির পর্য্যন্ত কাটিয়াদিয়াছেন, তাহা ও ধর্ম্মের ইতিহাসে অবগত হইতে পারা যায়। তাহার পর এই ধর্ম্মান্ধতা বা বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা যে কেবল এতদ্দেশেরই পুরাবৃত্তের কথা তাহা নহে, ইসলাম ধর্ম্মের একজন অতি প্রসিদ্ধ প্রবর্ত্তককেও একদিন ধর্ম্মার্থ পুত্র বলিদিবার জন্য এক প্রান্তরে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। তৎপর সুসভ্য খ্রীষ্টসম্প্রদায় বলেন, "জগতের কল্যাণের জন্য যীশু স্বয়ংই আত্ম

বলিদান করিয়া গিয়াছেন।" এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধর্ম্মের জন্য বলিপ্রদান সকল সম্প্রদায়েই প্রচলিত এবং তাহারও অনুষ্ঠান করিতে লোক ত্রুটি করে নাই। ইহা ভিন্ন সাধারণভাবে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই ধর্ম্মের জন্য কত যে নরবলি, পশুবলি ও নরনারীর নিপীড়ন করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করে কাহার সাধ্য। আর এতদর্থ পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ ও বক্তাবক্তিও বড় কম হয় নাই। সুতরাং এই অসাধারণ বস্তুর জন্য অধুনা কাহারও একটু বেশী গোড়ামী দেখিলে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা কি আছে? বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ্যে যেরূপ প্রতিযোগিতা ও জয়েচ্ছা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে মতের একটু দৃঢ়তা না থাকিলে আত্মরক্ষা করাই অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, ধর্ম্মের এই রাক্ষসী প্রবর্ত্তনা অর্থাৎ অন্যের ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিয়া আত্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা এইক্ষণে পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাওয়া উচিত। অধুনা পৃথিবীর সজ্জনেরা ধর্ম্মের সমন্বয় ও সম্মিলন দেখিতেই ভালবাসেন এবং তাহারই জন্য বিশেষ উৎসাহী।

ধন্য আমেরিকাবাসিগণ! ধন্য তাঁহাদিগের চেষ্টা ও ধন্য তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত উদার ধর্ম্মমণ্ডলীসংগঠন! কোথায় আমেরিকা, কোথায় ইয়ুরোপ, কোথায় চীন ও জাপান, আর কোথায় আর্য্য-ভূমি ভারতবর্ষ; তাঁহারা কেমন আগ্রহের সহিত পৃথিবীর এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ধর্ম্মমণ্ডলী একত্র করিয়া

আশ্চর্য্যরূপে সম্মিলনের ভাব প্রদর্শন করিলেন। নিশ্চয়ই ইহা। পরিণাম অত্যন্ত শুভ ও শান্তিপ্রদ।

তাহার পর ধন্য কেশবচন্দ্র। ও ধন্য তাঁহার সঙ্গীয় ধর্ম্ম বন্ধুগণ। তাঁহারা ও পৃথিবীর এই সার্ব্বজনিক সম্মিলনের প্রারম্ভই জীবনে যাহা অভিনয় করিয়া দেখাইলেন, তাহাও সাম্য এবং সম্মিলনেরই একটা অতি উৎকৃষ্টতম অধ্যায়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত আচার্য্য সত্যযুগের ধ্যান ও ত্রেতার যজ্ঞ অভিনয় করিয়া এবং দ্বাপরের আরাধ্য দেবতা আদ্যাশক্তি ভগবতী এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রকৃত ভাব বর্ণন করিয়া ও তৎপর শেষ যুগধর্ম্মে চৈতন্যদেবের ধ্বজ পতাকা উড়াইয়া খোলখরতাল সহ কীর্ত্তন ও নৃত্য প্রবর্ত্তিত করিয়া আশ্চর্য্যরূপে যুগধর্ম্মের সম্মান প্রদর্শন করিয়া গেলেন। কেবল তাহাও নয়, অতি উদারভাবে ঈশ্বর-পুত্র যীশুর জলাভিষেক অভিনয় ও তাঁহার পুত্রত্বের সদ্ব্যাখ্যা দিয়া জ্ঞানিমণ্ডলীতে যীশুর আদর বাড়াইয়া গেলেন। আর ইসলামধর্ম্মেরও একেশ্বরবাদিতার প্রশংসা এবং প্রেরিত পুরুষের সম্মানার্থ আপনাদের মণ্ডলীতে প্রেরিত শব্দের প্রয়োগ করিয়া অত্যন্ত উদারতা দেখাইয়া গেলেন। সর্ব্বশেষে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়রূপ নববিধান প্রবর্ত্তিত করিয়া আরও আশ্চর্য্যরূপে ধর্ম্মের এমন এক উদারতা ও এক প্রাণতা দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহা জনসমাজে সম্যক্ অভিনীত হইতে আরও বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া যাইবে। তাহার পর অংসঙ্গীয়

ধর্ম্মবন্ধুগণ কেহ মহম্মদীয় শাস্ত্র হইতে, কেহ খ্রীষ্টীয় বিধান হইতে, কেহ আর্য্যঋষিদিগের শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব বহন করিয়া, কেহ বা সংগীত দ্বারা সম্মিলন তত্ত্ব প্রচার করিয়া আর কেহ বা সকলের সেবা পরিচর্য্যা করিয়া চমৎকার রূপে মূল প্রবর্ত্তনারই সাহায্য করিয়া যাইতেছেন। অবশ্যই এতদ্দারা যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম এক হইয়া গেল, এমন কথা নয়, নিশ্চয়ই আচার নিষ্ঠা এবং বিবিধ অনুষ্ঠান প্রত্যেক সম্প্রদায়ে যার যার রুচি অনুসারেই বিভিন্ন আকারে প্রবর্ত্তিত থাকিবে। অথচ ধর্ম্মের যাহা উত্তমতা বা সারাংশ তাহা দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই নিকট সকলের শিক্ষনীয় এবং অনুকরণ যোগ্য; এই উদার ধর্ম্মনীতি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রই সর্ব্বাগ্রে জীবন দিয়া প্রদর্শন করিয়া গেলেন। নিশ্চয়ই তিনি এতদ্বিষয়ের সর্ব্ব-প্রথম প্রবর্ত্তক ও সর্ব্বাগ্রে ধন্যবাদার্হ।

যাহা হউক এই সম্মিলনের ভূমিতে আসিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্যজাতির একটী অতি গৌরবের বিষয় এই, তাঁহারা কাহারও ধর্ম্মের উচ্ছেদক নন এবং কখনও পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গতিরোধ বা মত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে যান নাই। তাহার পর ইহাও তাঁহাদের অত্যন্ত উন্নত এক উদারতা যে, তাঁহারা ভজনকালে ঈশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত প্রতি নিয়ত স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে; "ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়া লোকে আপন আপন

ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করে, ইহা কেবলই রুচির বিচিত্রতা মাত্র, সোজা পথেই চলুক আর বক্র পথেই চলুক, সেই ঋজু কুটীল নানাপথসেরী জনগণের এক তুমিই গম্য, যেমন বিভিন্ন দিগ্‌দিগন্তর দিয়া প্রবাহিত জলস্রোতের পক্ষে সমুদ্র।” বস্তুতঃ ঈশ্বরবিষয়ক এই সদৃষ্টান্ত উক্তিটী দ্বারা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মজ্ঞানের একটী সার্ব্বজনিক সুপরিষ্কৃত সম্মিলিত ভাব পরিব্যক্ত হইতেছে। তাহার পর আর একজন অতি উন্নতমনা সাধক সংগীতে অভিব্যক্ত করিয়াছেন যে, “মা! জানিয়াছি, তুমি ভোজের বাজী জান অর্থাৎ বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে পার, তোমাকে যে যে ভাবে ডাকে, তাহাতেই তুমি রাজি হও।” প্রকৃতপক্ষে এমন নিরপেক্ষতা, এমন সাম্যবাদ ও এমন হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টাননির্ব্বিশেষে সকল ধর্ম্মের সমাদর আর কোথাও কেহ দেখাইতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে যত দিন এই উদার ভাবটুকু পৃথিবীতে পরিস্ফুট না হইয়াছে, এবং সরল প্রাণে সকলই সকলের ধর্ম্মের সম্মান করিতে না পারিয়াছেন, তত দিন মানবজাতিতে ধর্ম্মকলহ ও সুতীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা থাকিবেই থাকিবে। আর্য্যা বামাসুন্দরী অবশ্যই এই অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা ভালবাসিতেন না, কিন্তু তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে ইহাতে যোগ দিতে হইয়াছে। ইঁহার বাড়ীতে কখনও কোন ব্রত পূজা হইতেছে দেখিলে খৃষ্টান মেম সাহেবেরা তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও একটী কৌতুহলের বিষয়

এই যে, তিনিও ধর্ম্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতে ও তাঁহাদিগের ভুল ভ্রান্তি দেখাইতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিতা হইতেন না। এক দিন তাঁহারা হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে নিন্দা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আচ্ছা ভাল, আমরা মাটী দিয়া মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিলেও তো সেই জগতের মাতা ও জগতের পিতা ঈশ্বরেরই পূজা করি কিন্তু আপনারা যে একজন মানুষের পূজা করেন, ইহার অর্থ কি আমাকে বুঝাইয়া দিউন। আপনারা এত দূর দেশ হইতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন, অথচ একজন মানুষকে পূজা করিতে বলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। তাহাতে মেম সাহেবেরা যীশুর অলৌকিক গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যীশু কি সামান্য মানুষ, তাঁহার সহিত কি কাহারও তুলনা হয়? তখন পণ্ডিতভার্য্যা বলিয়াছিলেন, আচ্ছা মানিলাম, তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি ও সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কিন্তু মানুষ ত, এই কথা অস্বীকার করিবেন কিরূপে। বাস্তবিক এই দিন তাঁহারা বামাসুন্দরীর কথার বিশেষ সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। অতঃপর দেবী হাসিতে হাসিতে আসিয়া স্বামিসন্নিধানে এই সমস্ত কথা বর্ণন করেন।

তাহার পর এক দিন হিন্দুর গঙ্গা তুলসীর কোনও মাহাত্ম্য নাই, এই সমস্ত পূজা করাতে শুধু অজ্ঞানতাই প্রকাশ পায়, ইত্যাদি বলিয়া মেম সাহেবেরা বামাসুন্দরীকে খুব আটকাইয়া ধরেন। কিন্তু তিনি এই দিবস আর কিছু

না বলিয়া তুলসী ও গঙ্গার মধ্যে বিশেষ কি আছে, ইহা ভালরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য স্বীয় জীবনসহচরকে আসিয়া বড়ই অনুনয় বিনয় করিয়া ধরেন। তাহাতে স্বামী বৈজ্ঞানিকভাবে গঙ্গা ও তুলসী বিষয়ে দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়া দেন, তাঁহার সেই বাঙ্গালায় লিখিত বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতত্ত্ব মেম সাহেবেরা কতদূর বুঝিয়াছিলেন, বলা যায় না। কিন্তু দেখা গিয়াছিল, অন্ততঃ গঙ্গা ও তুলসী সম্বন্ধে তাহারা ইহাকে আর কখনও কিছু বলেন নাই। পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য ঐ দুইটী প্রবন্ধ একটু সংক্ষেপ করিয়া আমি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

"সকলেই জানেন, এতদ্দেশে গঙ্গা একটী পুণ্যসরিৎ। ইহাকে স্বধুনীও বলে। স্বধুনী শব্দের অর্থ স্বর্গীয়া নদী। ইহার গূঢ় কথা এই সবিতা স্বীয় কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভূতল হইতে সতত যে বাষ্প আকর্ষণ করিতেছেন ও সর্ব্বভুক্ হুতাশন যে বাষ্পাকারে সধূমজলীয়াংশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন, তাহাই বায়ুতে বিধূনিত ও সংশোধিত হইয়া আকাশরূপ মহাযন্ত্রে সংগৃহীত হয়, তৎপর ইহাই আবার শৈত্যস্পর্শে গুরুভার হইয়া হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গে বরফরূপে সন্নিবেশিত ও তাহার পর সেই শুদ্ধ স্ফটিকবৎ হিমশিলাই আবার ক্রমশঃ দ্রব হইয়া নানারত্নের আকর গিরিরাজের অভ্যন্তরস্থ বিবিধ স্বর্ণাদি উৎকৃষ্ট ধাতু ও প্রস্তর নিচয় বিধৌত করিতে করিতে অতি উপাদেয় গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রবাহিত। অতএব দেখা

যাইতেছে, ইহার মূলেই এমন একটু বিশেষতা আছে, যাহা অন্য নদীতে সম্ভবে না। সুতরাং তাদৃশ বিশোধিত পুণ্যবারি যে অবগাহিত জীবকে শরীরে আরোগ্য মনে স্ফূর্ত্তি ও আত্মাতে পুণ্য প্রভাব প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মদ্রবী নামে বিখ্যাত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি।

পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গঙ্গা-তীরে অসংখ্য ধর্ম্মমনা ঋষির আশ্রম ছিল, সেই তত্ত্বদর্শী সত্যবাদী ঋষিগণই গঙ্গাজলের স্বর্গোৎপাদিকা শক্তি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সাক্ষ্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়, গঙ্গাজলে স্নান করিলে পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ অর্থাৎ অতি পুরাতন বিকারও বিনষ্ট হয়। ইহারও প্রকৃত কথা এই গঙ্গাস্নায়ী ব্যক্তি সেই বিশুদ্ধ মঙ্গলবারিতে আপ্লুত হইয়া এমনই অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করেন যে, তাহার অন্তরে বাহিরে আর কিছু মাত্র দুরিত অর্থাৎ পাপবিকার থাকে না। শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত আছে, গঙ্গাস্নানে সদ্যমুক্তি হয় না, ক্রমশঃ অন্তরে স্ফূর্ত্তি ও আত্মাতে দিব্যজ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়া পুণ্যানুসরণ করিতে করিতে মুক্তির পথ সহজ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সদ্যমুক্তি হয় না, এই কথাটীতেই আর্য্য ঋষিদিগের উত্তম বৈজ্ঞানিকতা প্রকাশ পাইতেছে। শাস্ত্রে আবার ইহাও আছে, মুষল অর্থাৎ একটা কঠিন কাষ্ঠে দণ্ডের ন্যায় নিতান্ত জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া স্নান করিলেও গঙ্গাস্নানের ফল হইয়া থাকে। ইহারও যুক্তি এই, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাত

সারে কোনও দূষিত জলাশয়ে স্নান পানাদি করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ শরীরে রোগের অঙ্কুর ও চিত্তে অবসাদ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ বিবিধ ধাতব ও খনিজাদির রাসায়নিক সংমিশ্রণে উত্তম গুণবিশিষ্ট আরোগ্য বারিতে স্নানাদি করিলেও যে অবশ্যই শরীর ও মন উত্তরোত্তর অধিকতর সুস্থ ও উত্তম গুণসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে। এতদ্দেশে একটা প্রবাদ আছে, উদ্ধৃত গঙ্গোদকে কখনও কীট জন্মে না, এই কথাটাতেও গঙ্গাজল যে অতি বিশুদ্ধ ও তাহাতে প্রাকৃতিক কোনও অলক্ষিত বিশেষ গুণ সংনিহিত আছে, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

আর ভারতীয় শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ যে কোনরূপ অন্ধ বিশ্বাস বা কোন বদ্ধমূল কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গঙ্গামাহাত্ম্য জনসমাজে প্রচার করেন নাই, তাহারও একটা অতি বিশিষ্ট প্রমাণ এই, পদ্মা প্রভৃতি যে অংশে আসিয়া অন্য গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন নদের জল সংমিশ্রণে গঙ্গার ঐ প্রাকৃতিক উত্তম গুণরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, তথায় গঙ্গা মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় নাই। এই অস্বীকৃতিই বাস্তবিক বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকতার সবিশেষ পরিচয় মনে করিতে হইবে।"

আর "বেদান্তাদি উন্নত দর্শন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই, আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ও গ্রহাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং পরভরণের জন্য সতত বর্দ্ধনশীল বৃক্ষাদি ও পর্ব্বত নদী সমুদ্র প্রভৃতি যাহা কিছু জাত পদার্থ সকলই জগৎপাতা

বিষ্ণুর শরীর অর্থাৎ বহিরাবরণ; অতএব এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে অনন্তভাবে তাঁহারই বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই বিশ্বের জল অগ্নি প্রভৃতি সকলই এক একটী করিয়া সর্ব্ব কর্ত্তা প্রভু পরমেশ্বরের এক এক রূপ করুণা নিঃসরণের যন্ত্র মাত্র। যেমন কোন স্থির হ্রদের জল ভিন্ন ভিন্ন জল প্রণালী দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অগ্নির মধ্য দিয়া জলের মধ্য দিয়া ও বৃক্ষাদি তাবৎ উৎপন্ন বস্তুর মধ্য দিয়া একমাত্র ঈশ্বরেরই মঙ্গলাভিপ্রায় অনবরত ক্ষরিত হইতেছে। দেশের পণ্ডিত-বর্গ অবগত আছেন, এতদ্বিষয়ে শ্রুতির ও বিশিষ্ট ইঙ্গিত, এই "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" এক দেবতা সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বিদ্যমান। ফলতঃ এই সুগভীরতত্ত্ব হৃদয়ে বিধৃত থাকিলে কেবল গঙ্গা বা তুলসী কেন, বিশ্বের যে কোন নদ নদী বা যে কোন তরুবল্লী সাক্ষাতে করিয়াই বিষ্ণুকে প্রণাম করা যাইতে পারে। তাহার পর সকলেই জানেন, আয়ুর্ব্বেদমতে তুলসী একটী মহৌষধি বিশেষ; ইহার পত্র এবং মঞ্জরী নানা ঔষধে ব্যবহৃত। অধুনা অনেক বহুদর্শী সুবিজ্ঞ ডাক্তার ইহার ম্যালেরিয়া নাশকর্ত্তী গুণ, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে একটী তুলসীগাছ রোপিত থাকিলে তদ্দ্বারা যে ঐ বাড়ীর বায়ু পবিত্র এবং আরোগ্যপ্রদ হয় অথচ ইহা ঈশ্বরেরই সাক্ষাৎ করুণা তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে।

তৎপর দেখিতে হইবে, কোনও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত যদি স্নানের সময় একটী তুলসীপত্র হস্তে করিয়া বিশ্বের পালনকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ সঙ্কল্প পূর্ব্বক জলে তুলসীপত্রটী আলোড়িত করিতে করিতে সেই তুলসী সংশোধিত আরোগ্য বারিতে সর্ব্বাঙ্গ নিমজ্জন পূর্ব্বক অবগাহন করেন, তাহাতে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকতা বই আর কি প্রকাশ পাইতে পারে। তবে অবশ্য একটী তুলসীপত্রে বাশীকৃত জল কিরূপে সংশোধিত হয়, ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কিন্তু অধুনা এত হোমিওপ্যাথিক সুসূক্ষ্ম বস্তু বিজ্ঞান প্রচলনের পরেও আবার এই আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সঙ্গত নহে, জ্ঞানে হউক অথবা অজ্ঞানে জলে শক্তিসঞ্চার হয়, ইহাই স্বীকার করিতে অধুনা জনসমাজ বাধ্য।

ইহা ভিন্ন সন্ধ্যাবন্দনাদি কোনও পুণ্য ক্রিয়ার অনুসরণ সময়ে দেহ শুদ্ধি অন্তঃশুদ্ধি অথবা ভাবের নির্ম্মলতাউৎপাদনের আকাঙ্ক্ষায় কোনও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি যদি এই অপূর্ব্ব মহৌষধি মিশ্রিত বারিদ্বারা আচমন পূর্ব্বক শরীরস্থ সপ্তধাতুকে জাগ্রত ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধির কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফুরণ করিয়া লইতে পারেন, তাহা যে ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে অত্যন্তই এক উপকার এই কথা অস্বীকার করিতে পারেন কে?

ইহার পর আবার আসন্ন মৃত্যু সময়ে তুলসীবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত কোনও ব্যক্তি যদি হিমাচলের অনন্ত বক্ষ বিধৌত পবিত্র গঙ্গোদকে তুলসী মিশ্রিত করিয়া তাহাকেই অন্তকালের

কক্ষাশ্রিত পরলোক-যাত্রীর মুখে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রদান করেন এবং তদ্দ্বারা ঐ অবসন্নপ্রায় মুমূর্ষু ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ শক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জাগ্রত করিয়া তারকব্রহ্ম নামটী শুনাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহা কি বাস্তবিক তৎকালোচিত একটী অতি প্রশংসনীয় জ্ঞানের কার্য্য হয় না ?

অথবা যে জড়বিজ্ঞান পটু তুলসীপ্রিয় পণ্ডিত তুলসীকে হেমমণি ও মঞ্জরীকে বহ্নতুল্য বলিয়া আদর করেন এবং সজ্ঞানে বুঝেন, এই বস্তু দুইটী জীবনেও উপকারী এবং মৃত্যু সময়েও পরম সাহায্যকারী, তিনি যদি ঐ মহোপকারী পদার্থদ্বয়ে চন্দন-মাখাইয়া অত্যন্ত আদরের সহিত জীবন মরণের আশ্রয় বিশ্বের পালনকর্ত্তা কেশব বা সর্ব্বব্যাধির উপশমকারী মৃত্যুঞ্জয় শিবের চরণ উদ্দেশে দিয়া প্রণিপাত করেন, তবে কি তাঁহাকে জড়বিমূঢ় না বলিয়া মহোপকারী জড়স্রষ্টা ঈশ্বর প্রেমিক বলা সঙ্গত নহে। আমি বিবেচনা করি, 'যাঁহারা উদ্ভিদ্‌বেত্তা ও জড পরমের মর্ম্মজ্ঞ তাঁহারা আর্য্যজাতির প্রবর্ত্তিত' এই তুলসী বিজ্ঞানের সম্যক্ আদর না করিয়াই পারেন না।"

এই সমস্ত বর্ণনা শুনিয়া আর্য্যা বামাসুন্দরী অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছিলেন। ইহার পর আর একদিন পতিমুখে বিষ্ণুপ্রণামের মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া দেবী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। ' স্বামী বলিয়াছিলেন, "নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ। জগদ্ধিতায়কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥" এই

মন্ত্রটীদ্বারা চতুর্যুগের অভিমুখী হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার করা হয়। সত্যযুগে প্রজাকুল একমাত্র ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতেন এই জন্য—"নমোব্রহ্মণ্যদেবায়" বলিয়া সর্ব্বাগ্রে সত্যযুগের অভিমুখে ব্রহ্মভাবে ভগবান্‌কে নমস্কার করিবার বিধি। তাহার পর ত্রেতাযজ্ঞপ্রধান যুগ, এই যুগে প্রজাবর্গ যজ্ঞের মধ্য দিয়াই ধারাবাহী ভগবদনুগ্রহ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হইতেন; এই নিমিত্ত যজ্ঞকেই * বিষ্ণু বলিয়া শ্রুতিতে ধারণ করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য বিষ্ণুর এক নাম যজ্ঞমূর্ত্তি। তৎপর সকলেই জানেন সেই যজ্ঞ সাধন হবি গোতে এবং মন্ত্র ব্রাহ্মণে বিদ্যমান। সুতরাং এতদ্দ্বারা যে পরমেশ্বর গো এবং ব্রাহ্মণকে বিশেষরূপে মহিমান্বিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্যই ঐ দ্বিতীয় যুগের দ্বারে গো ব্রাহ্মণ হিতকারী বলিয়া বিষ্ণুকে নমস্কার করা হয়। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দ্বাপরযুগে অভিব্যক্ত দেবতা, এই শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখেই বিষ্ণুর শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি নবধা ভক্তি প্রকটিত হয়। ফলতঃ এই পরিস্ফুট ব্যক্ত ভাব না আসিলে জগতের এই হিতসাধন অর্থাৎ ভক্তিযোগের বিকাশ হইত কিনা সন্দেহ। কৃষ্ণসম্বন্ধে অধুনা যিনিই যাহা বলুন না কেন কিন্তু যোগিগণের ভাবনা অন্য প্রকার। তাঁহারা এই গভীর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয় ভাবের ভিতরেই সেই বংশিবদন নটবরের অরূপরূপ লুক্কায়িত দেখেন এবং সেই অব্যক্ত বিশ্ববিমোহন রূপ লক্ষ্য করিয়াই

* যজ্ঞোবৈবিষ্ণুরিতিশ্রুতিঃ।

এই ভক্তিযুগের দ্বারে "জগদ্ধিতায়কৃষ্ণায়" বলিয়া সকলে শির অবনত করিয়া থাকেন।

তাহারপর সর্ব্বশেষ কলিযুগে বিষ্ণুর নামকীর্ত্তনই প্রধান ধর্ম্ম। এইখানে ভক্তবৃন্দ নাচিয়া গাইয়া পরমানন্দে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিয়া ধন্য। এই উপক্রমে সাধুভক্তগণ একটী সুমিষ্ট গাথা সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। "গো কোটিদানং গ্রহণে চ কাশী মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী। সুমেরু সমান হিরণ্যদানং নতুল্য নতুল্য গোবিন্দ নামং।"

ইহাতে বুঝিতে হইবে, প্রথমটী জ্ঞানযুগ, দ্বিতীয়টী ক্রিয়া যুগ, তৃতীয়টী ভক্তিযুগ, এবং চতুর্থ কলি জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনেরই পরিণতি স্বরূপ ভক্তগণের মহালোভনীয় সংকীর্ত্তন প্রধান আনন্দের যুগ। শাস্ত্রে লিখিত আছে—সত্যযুগে ধ্যান ত্রেতাতে যজ্ঞ ও দ্বাপরে অর্চ্চনা—অর্থাৎ ভক্তিযোগদ্বারা যাহা লব্ধ হইত, কলিতে কেবল সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই সেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

ইহাভিন্ন ইতিপূর্ব্বে বামাসুন্দরী পতির অত্যাদরে বর্ণিত "ভারতীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান" ও "অবতারবাদ" এই দুইটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হইতেও অনেক সারতত্ত্ব অবগত হয়েন। তাহারপর ইহাও একটী নিতান্তই সুখের বিষয় যে, খ্রীষ্টান মহিলাদিগের সহিত সময় সময় বামাসুন্দরীর যে বাদানুবাদ হইত, তাহাতেও

* গোবিন্দ নামের অর্থ এই—গাং স্বর্গং পরমানন্দাবস্থাং বিন্দতি লভতে যঃ সগোবিন্দঃ। পরমানন্দময়ঃ ইত্যর্থঃ।

ইঁহার ধর্ম্মোৎসাহবর্দ্ধিত এবং নানাবিষয়ে শিক্ষা হইয়াছিল তাহার পর ইহাও দেখা গিয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধে মেম-সাহেবদিগের সহিত সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক হইলেও তাঁহারা ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং বলিতেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমরা বড় সুখী হই। আপনি কথার উত্তর দেন এবং ভাল মন্দ বঝেন।"

ইহাভিন্ন দেশীয় স্ত্রীমহলেও বামাসুন্দরীর ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমতের একটু সম্ভ্রম ছিল, একদা একটী মহিলা সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বামাসুন্দরীর একটু বেশী আটা আটি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, সকলেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখি, কিন্তু সহরে থাকিয়াও দিদির আর কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তাহাতে ঐ পণ্ডিত পত্নীও হাসিমুখেই উত্তর করিয়াছিলেন, ভইন! ইহাতে আর লাভ কি? ধর্ম্ম তো আর খেলিবার জিনিষ নয় যে একটা ভাল লাগিল না তো আর একটা নিলাম। আর এক কথা দেখুন, ধর্ম্মের সম্বন্ধে লোক নানাকথা বলে, তাহার মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা সকল সময়ে বুঝিয়াও উঠিতে পারি না, অতএব আমার মতে যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, সেই ধর্ম্মেই পড়িয়া থাকা ভাল। আর আমি মনে করি আমাদের মুনি ঋষি হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তবে যদি তাঁহাদের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকুক, তাহা হইলে সেই ভুল আমারও থাকুক, ইহাতে আমি কোনই কষ্ট মনে

করি না।" আর দেখুন মানুষ যখন হইয়াছি, তাহাতে ভুল ভ্রান্তি তো থাকিবেই। আর ভাবিয়া দেখিলে, এই ভুল সকলেরই আছে, তবে আর পরিবর্ত্তন করিয়া লাভ কি ?

গোহাটী হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব সম্মানিত হেডমাষ্টার মহাত্মা অভয় বাবু তাঁহার এই ভাগিনেয়ীকে অত্যন্ত সম্ভ্রম করিতেন। এবং ধর্ম্মবিষয়ে কিছু একটু বেশী গোঁড়ামী থাকিলেও তাঁহার মতের দৃঢ়তার জন্য প্রশংসা করিতেন।

এক দিবস একটী মহিলার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে বামা-সুন্দরীর অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, তাহাতে ঐ ভদ্রমহিলা নানা দেবদেবীর পূজা না করিয়া খাটি ভাবে এক ঈশ্বরের পূজা করা যে উত্তম ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তিনি অতি মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ভইন ! আসলে বিশ্বাস থাকিলে ঘোরাইয়া ফিরাইয়া সমান কথাই। ব্রাহ্মসমাজেরও তো একটী গানের মধ্যে আছে না, "আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্য করে। আদ্যাশক্তি ভগবতীরূপে লক্ষী, সরস্বতী, একাধারে কত কোটি কোটি রূপ ধরে।" তবে আর আমাদের দোষ কি, আমরাও তো মায়ের কোটি কোটি রূপেরই পূজা করি এবং কোটি কোটি রূপেই ফুলচন্দন দিয়া ভক্তি দেই; ইহাতে আর দোষের কথা কি আছে।

একদা বামাসুন্দরীর সম্পর্কিত কোন একটী লোক তাঁহাকে বড়ই আটাইয়া ধরিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,

যে, মানুষ কি ঈশ্বর বানাইতে পারে, ঈশ্বর বিশ্বের কর্ত্তা, তাঁহাকে আবার আপনারা মাটী দিয়া পাথর দিয়া গড়াইয়া লন, ইহা যে অত্যন্ত এক বালকতা। তাহাতে পণ্ডিত-বনিতা অতি তেজের সহিত বলিয়াছিলেন, বালকের কাছেই বালকতা, পণ্ডিতের কাছে নয়; ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে বড় বড় পণ্ডিতের জ্ঞানই এই মূর্ত্তিতে আছে। এই সম্বন্ধে বামাসুন্দরীর স্বামী একদিন তাহার স্বরচিত "ভারতীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান" প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া প্রিয়তমা পত্নীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরীয়তত্ত্ব অতি গভীর ও দূরবগম্য, এমন কি অনেক সময়ে ঈশ্বর আছেন কিনা, ইহাই তর্কের বিষয় হইয়া থাকে। বুদ্ধদেব এক ক্রমে ছয়টী বৎসর অতি কঠোর ভাবে ধ্যান ধারণা করিয়াও এক সময়ে একেবারে নিরাশ হইয়া কিছু নাই বলিয়াই মনে মনে একটা ধারণা আনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শেষে জ্যোতিরূপ দর্শন হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কপিল প্রভৃতি অতি বড় বড় দার্শনিকেরা প্রায় অনেকেই নিরীশ্বর ছিলেন। আর সুসভ্য খৃষ্টসম্প্রদায় তো এখনও বিশ্বাস করেন যে, যীশুই মনুষ্যের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা, কেননা ঈশ্বরের নিকট সাক্ষাত্তাবে জীবের যাইবার কোন অধিকার নাই। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝাইতেছে, ঈশ্বরতত্ত্ব সকলেরই নিকট অতি দুর্ব্বোধ্য।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব এইরূপ দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই সেই

দুরূহতর্ক লোক ধারণায় আনিয়া সাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া দিবার নিমিত্ত আর্য্য-মনীষীদিগের নিকট মূর্ত্তি-যন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। অধুনা এই ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তনাতে এই উপকার হইয়াছে যে, সাধকগণ অভীষ্ট মূর্ত্তিটী সাক্ষাতে করিয়া স্থিরচিত্তে একটু অনুধ্যান করিলেই সেই অরূপ অগম্য জগৎপিতা বা জগৎমাতার যে কোন শক্তি বা স্বরূপ জ্ঞান যে মূর্ত্তিতে সন্নিবেশিত করিয়া রাখা হইয়াছে, তৎ-সমুদয়ই অনায়াসে সাধকের চিত্তে অবভাসিত হয় এবং তখন সাধক মানসিক উপচার দ্বারা সেই বিস্ফুরিতরূপে পূজা ও প্রণিপাত করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। তাহার পর আবার বাহিরেও গন্ধ পুষ্প দিয়া সেই অরূপরূপেরই অর্চ্চনা করেন ও তদুদ্দেশে নমস্কার দেন।

বস্তুতঃ ইহা ভ্রান্তিজ্ঞান কিংবা বালকতা নয়, এই মূর্ত্তি পূজার প্রবর্ত্তনাতে এক মহা পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞান সূচিত হইতেছে। ফলে একটী কালীমূর্ত্তি বা একটী শিবমূর্ত্তিতে কি গভীরতত্ত্ব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া নিতেও এক মহাপাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা হইয়া থাকে।

যাহা হউক দেখা গিয়াছে, নির্ভয়তা বামাসুন্দরীর ধর্ম্মজীবনের এক মহাবল ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহা সমর্থন করিতে কাহাকেও ভয় করিতেন না। আর কি সমাজ নীতি ও কি ধর্ম্মনীতি কোন বিষয়েই এক তিলও হেলিতে দোলিতে চাহিতেন না। সামাজিক আচার

ব্যবহার সম্বন্ধে পাড়া-প্রতিবেশী প্রায় অনেকের সহিতই ইহার মিল হইত না। কোন কোন সময়ে কাহারও কোনরূপ সমাজ বিরুদ্ধ আচরণ দেখিলে, তিনি তাহার বাড়ীতে থাকিবেন না বলিয়া অনেক সময়েই আপত্তি করিয়া বসিতেন। তখন স্বামী সময়ে সময়ে মহা বিপাকে পড়িতেন এবং বলিতেন তোমার একটু দেশকালের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত। ইহাতে একদিন বামাসুন্দরী বলিয়াছিলেন, আপনি যাহাই বলুন, আমি আমার ধর্ম্মনাশ করিয়া মানুষের খাতির রাখিতে পারি না"।

একদা স্বামী কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইয়া খাইবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, তাহাতে আর্য্যা বামাসুন্দরী অতি তেজের সহিত বলেন যে, আপনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহাতে পণ্ডিত, শাস্ত্র পড়িয়াছেন, আপনি সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও কেমন করিয়া আমাকে একজন অনাচারী লোকের সঙ্গে মিশিতে বলেন। তখন স্বামী আর কি করেন, কিছু না বলিয়া একটু হাসিয়াই নিবৃত্ত হইলেন।

পতি ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাকে কখনও কিছু বলিতেন না, তিনি স্বাধীনভাবেই আপনার রুচি অনুসারে ব্রত নিয়ম পালন করিয়া গিয়াছেন এবং সামাজিক বিষয়ে বামাসুন্দরীর বড় আটা আটি ছিল; নিন্দার কথাই হউক আর প্রশংসার কথাই হউক তিনি পারিতপক্ষে প্রতিবেশী কাহাকেও সমাজের

নিয়মভঙ্গ করিতে দিতেন না। অথচ দেখাগিয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ গোঁড়ামী থাকিলেও কি স্বদেশীয়া ও বিদেশীয়া সকলেই তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত আদর করিতেন। তিনিও নিতান্ত বিরক্ত না করিলে কাহাকে কিছু বলিতেন না। আর যে দেশের হউক না কেন, তিনি আলাপ করিয়া সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন। দেবী যেমন সদ্বংশজাতা ছিলেন তেমনই তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা, আচারনিষ্ঠা এবং বিনয় ভদ্রতাও ঠিক তদনুরূপই ছিল। ইহার পৈত্রিক যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে বার্ষিক খাজানা যাহা পাইতেন, তাহার অধিকাংশই লৌকিক ভদ্রতা ও নিজের অভিমত ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করিতেন।

আর্য্য-নারী বামাসুন্দরী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জীবনের শেষবার্ত্তা।

পণ্ডিতভার্য্যা বামাসুন্দরী দেবীর একটী বড়ই সৌভাগ্য যে, তিনি যদিও একটী দুষ্পরিহার্য্য রোগের প্রবর্ত্তনায় একটু অসময়েই সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন, তথাপি রুগ্নশয্যায় শুইয়া শুইয়া সম্পূর্ণ একটী বৎসর পূজ্যপাদ জীবন সহচরের নিকট একটী একটী করিয়া খুজিয়া জীবনের বিবিধ বার্ত্তা ও অন্তিম কালের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে হইতে জীবন-সীমায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেইখানেও তদীয় স্বামী অতি যত্নের সহিত যেন কত আগ্রহান্বিত হইয়া প্রিয়তমা সঙ্গিনীকে সেই শান্তিময়ী আনন্দপুরীরদ্বারে লইয়া পৌঁছাইয়াদেন।

বামাসুন্দরীর শেষবার্ত্তা এই—তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী চারুপ্রভার বিবাহ দিবার জন্য পতিসঙ্গে শ্রীহট্টে যাইয়া আসিতে আসিতেই নিদারুণ রক্তপ্রদর পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তাহাতে তদীয় স্বামী প্রথম তিন মাসকাল

একজন বহুদর্শী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদ্বারা চিকিৎসা করান। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই—তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। তৎপর ডাক্তারবাবুর পরামর্শক্রমেই পতি শশব্যস্ত হইয়া সেই অত্যাদরের ভার্য্যার চিকিৎসার্থ তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করেন। অবশ্য ঐ কাতরাবস্থায় স্বামী অত্যন্ত সাহস করিয়াই ইহাকে কলিকাতায় লইয়া যান। দেখা গিয়াছে, এই সময়ে খৃষ্টান মিশনরি মিস্ উইলিয়ম নানাবিষয়েই ইহাদের সাহায্য করেন; কলিকাতায় যাইবার দিবস ইনি ঠিক যেন একজন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মত বামাসুন্দরীর সঙ্গে লইবার জিনিষপত্রগুলি নিজ হস্তে গুছাইয়া গাছাইয়া দিয়া যান। তাঁহার ভদ্রতার বিষয় অধিক আর কি লিখিব, তিনি বামাসুন্দরী দেবীর লেপের উসারখানার এক স্থানে যে একটু টুটা ছিল, তাহা নিজ হস্তে শিলাই করিয়া উসারটী লেপে সংযোজনপূর্ব্বক সঙ্গীয় অন্যান্য বস্তুর সহিত অতিপরিপাটিরূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং কলিকাতার ইডেন হাস্পাতালের প্রধান সিষ্টার ও বড় মেম-সাহেবের নিকট চিঠি দ্বারা বামাসুন্দরীর বিশেষ প্রতীকারের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। এই বিদেশীয়া মহোপকারিনী নারীরত্নের এই সমস্ত সদ্গুণের কথা বামাসুন্দরী ও তদীয় স্বামী পথে পুনঃ পুনঃই স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

অবশ্য অনেকেই জানেন, স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য কলিকাতার ইডেন হাস্পাতাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। তথায়

জুবার্ট নামক যে একজন সর্ব্বাধ্যক্ষ ইংরেজ ডাক্তার আছেন, স্ত্রীলোকের চিকিৎসাবিষয়ে তাঁহার মত লোক এক্ষণে আর ভারতবর্ষেই নাই, এইরূপ অনেকের ধারণা। ঐ সাহেব প্রথম দিন সামান্য রকম অপারেশন করিয়া বলিয়াছিলেন, ইঁহার জরায়ু-মুখে ক্যান্সার হইয়াছে; তথাপি এখনও অবস্থা ভাল, আর একদিন অপারেশন করিয়া দিলেই ইনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ঐ সামান্য অস্ত্রচিকিৎসার পর দুই মাস পর্য্যন্ত ইঁহার দুর্ব্বলতা কিছুতেই সারিল না। সুতরাং সেই অভিমত অপারেশনও আর হইতে পারে নাই। যাহা হউক সেই হাস্পাতালে যাইয়া বামাসুন্দরী তথাকার মেমসাহেব ও ধাত্রীদের সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। এই হাস্পাতালের বড় মেম-সাহেবের নিকট শিলচর হইতে মিস্ উইলিয়ম প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বামাসুন্দরীর অবস্থা জানিবার জন্য চিঠি লিখিতেন। অবশ্য এই চিঠির খাতিরেই তথাকার সমস্ত মেম বামাসুন্দরীকে একটু বিশেষ প্রীতি ও সমাদর করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখিতেন। আর দেশীয় ধাত্রীরাও যেন নিতান্ত আত্মীয়ার ন্যায় সর্ব্বদা ইঁহার নিকট যাতায়াত করিত।

বামাসুন্দরীর স্বামী প্রিয়তমা পত্নীর জন্য তথায় একটী স্বতন্ত্র কোঠা ভাড়া করিয়া নিয়াছিলেন এবং শুশ্রূষার্থ একটী ঝি রাখিয়াছিলেন। তাঁহার উপরেও আবার মেতরাণীদিগকেও

দারোয়ানকে প্রায়ই কিছু কিছু দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। তাহাতে ঐ হাস্পাতালের সকলেই যেন ইহাদের আপনার লোক হইয়া গিয়াছিল। প্রিয় পতি প্রাতে এবং বৈকালে যাইয়া দুধ মিছরি দিয়া আসিতেন, আর মধ্যাহ্নে বাসা হইতে দেবীর রুচি অনুসারে মাছের ঝোল এবং অন্যান্য ভাল তরকারী সহ অন্ন পথ্য নিয়া নিজ হস্তে অত্যন্ত যত্নের সহিত আহার করাইয়া আসিতেন এবং নিজেই মুখ ধৌত করিয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে রাখিয়া আসিতেন। তাঁহার এই ভালবাসা ও যত্ন দেখিয়া একদিন একটি মেম উপরতলা হইতে বড় মেমসাহেবকে যাইয়া ডাকিয়া আনেন, এবং দূরে থাকিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপার দেখাইলে বড় মেম তাহাতে অত্যন্ত প্রীতা হইয়া হাসিতে হাসিতে দেবীর প্রেমমোহিত স্বামীর পৃষ্ঠে অত্যন্ত ভালবাসা জ্ঞাপক হস্তমর্দ্দন করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবু! আপ্‌কা কাম্ মেম-লোক বড়ি পছন্দ কর্ত্তায়। জরুকো এত্না পিয়ার কর্নেওলা আদ্‌মী, উন্‌লোক ইহাপর আওর নেই দেখ্‌তা হে।" তাহারপর দেখা গিয়াছে, মেমসাহেবেরা এই দিন হইতে শ্যামাসুন্দরীকে যেন আরও একটু বেশী আদর করিতেন। এতদ্ভিন্ন স্বামী যে বিকাল বেলায় যাইয়া দেবীর নিকট বসিয়া প্রায়ই কোন একটা ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন ও আদরাতিশয়ে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন, ইহাতেও সেই সুসভ্যা মেমসাহেবেরা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। কেবল মেমসাহেবরা কেন, নিকটস্থা অন্যান্য ভদ্ররোগিনীরাও এই

সপ্রেম সুমিষ্ট ব্যবহারে পরিতুষ্টি লাভ করিতেন এবং বামা-সুন্দরীর স্বামী চলিয়া আসিলে অনেকেই তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন। তৎপর আবার যথাসময়ে প্রিয় পতি তথায় গেলে এই সমস্ত কথা বলিয়া দেবী নিজেও অশ্রুবর্ষণের সহিত নিজের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেন।

তাহারপর স্বামী দুইবেলাই দুধ মিছরি দিয়া আসিবার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি করিয়া তাম্বুল দিয়া আসিতেন, পণ্ডিতপত্নী তাহা ধাত্রী এবং অন্যান্য ভদ্র স্ত্রীলোক যাহারা বিকাল বেলায় রোগিনী দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে দিয়া আদৃত করিতেন। বস্তু অবশ্যই অতি সামান্য তথাপি বুঝিতে হইবে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট এক প্রেমব্যবহার। বস্তুতঃ নারীজীবনে ইহাও অতি শোভনতম দৃশ্য যে, নারীগণ সুখে সম্পদে কিংবা ঘোর দুঃখ বিপত্তিতে পড়িয়াও স্বীয় স্বভাবসুন্দর মাধুর্য্য গুণটুকু একবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। আর প্রকৃত পক্ষে সুখ সম্পদ চেয়ে দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত থাকিয়াও যে সদ্ব্যবহার, তাহাই অধিকতর মনোজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন রোগিনীদিগের শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান জন্য পালাক্রমে যে সমস্ত মেম তথায় উপস্থিত থাকিতেন, তন্মধ্যে একটী প্রাচীনা মেম দিবসে অনেকবারই চা সেবন করিয়া থাকেন; তিনি বামাসুন্দরীকে এত ভালবাসিতেন যে, অনেক সময়েই প্রসন্নমুখে "ও" হাসিতে হাসিতে আসিয়া নিতান্ত

প্রণয়িনী আত্মীয়ার ন্যায় ইহার নিকট হইতে চার জন্য দুধ চাহিয়া নিতেন। অবশ্য ইহাও বামাসুন্দরীর প্রতি তাঁহার এক অসামান্য ভালবাসারই চিহ্ন বলিতে হইবে। আর একটি অত্যন্ত আমোদপ্রিয়া মেম বামাসুন্দরীকে এত আদর করিতেন যে, অপরাহ্ণ ১টা ২টার সময়ে হাস্পাতালে যখন পুরুষলোক কেহই থাকিত না, তখন সেই দিব্যাঙ্গনা নৃত্য করিয়া বামাসুন্দরীকে হাসাইতেন ও আমোদ করিতেন। আর বামাসুন্দরীর সর্ব্ব কনিষ্ঠা মেয়েটী প্রতিরোজই বিকালবেলায় মাতাকে দেখিবার জন্য পিতার সঙ্গে হাস্পাতালে যাইত, ইহার প্রতিও মেম সাহেব ও ধাত্রীদিগের অসাধারণ স্নেহ ছিল; তাঁহারা অনেক সময়েই ইহাকে দেখিলে একজনের ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্য জনের ক্রোড়ে নিয়া যাইতেন এবং নানাকথা কহিয়া আমোদ করিতেন।

মধ্যযোগে এক দিবস প্রাতে বামাসুন্দরীর স্বামী শিশুকন্যাটীকে সঙ্গে করিয়া সেই স্নেহময়ী ভার্য্যাকে চা ও দুধ দিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করেন। তখন গোস্বামীজি এক ত্রিতল বাটীতে অনেক ভক্তলোকে পরিবেষ্টিত থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তিনি ইহাকে দেখিয়াই অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পর কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগ্রেই কন্যাটী সঙ্গে কেন, জিজ্ঞাসা করেন এবং অতি সমাদরে স্বসন্নিধানে বসাইয়া তাঁহার পত্নীর অবস্থা পরিজ্ঞাত হন। এই মহাপুরুষের

সহিত বামাসুন্দরীর স্বামীর শ্রীবৃন্দাবনে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই পূর্ব্বপরিচয়বশতঃই গোস্বামীজি বামাসুন্দরীর কয়টী সন্তান ও তাহারা কে কোথায় আছে এবং উপস্থিত কন্যাটী সম্বন্ধেও বিশেষ করিয়া নানাকথা জিজ্ঞাসা করেন। এই গোস্বামীর একজন অনুগত প্রবীণ ভক্তলোক বলিয়াছিলেন যে, আহা তবে তো পণ্ডিত মহাশয় এই কন্যাটীকে নিয়া মহা কষ্টেই পড়িয়াছেন। রোজ রোজ ইহাকে নিয়া হাস্পা-তালে যাতায়াত করা কি বড় সহজ কথা। তাহাতে বামা-সুন্দরীর স্বামী বলিয়াছিলেন,—"সংসারে মোট বহন করিতেই তো আসিয়াছি, তাহাতে আর আপত্তি কি; প্রভু যখন যাহা করিতে বা বহন করিতে বলেন, তাহাই অক্লান্তভাবে করিতে হইবে। উপস্থিত মতে প্রভুর আদেশ পালন করাই যে, ভৃত্যের কাজ।" গোস্বামী মহাশয় এই কথাটী শুনিয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, ঠিক এইরূপই তো মনে করিতে হইবে; তাহা হইলে দুঃখের মধ্যেও যে অপার সুখ ও শান্তিলাভ করা যায়। ইহারপর তিনি আর একদিন যাইয়া দেখিলেন, গোস্বামী অভিনিবিষ্ট হইয়া উৎকল বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছেন, এই দিবসেও নানাপ্রসঙ্গে অনেক সুমিষ্ট কথা হইয়াছিল এবং গোস্বামী মহাশয় বামাসুন্দরীর কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন। তাহারপর তিনি অন্য আর এক-দিবস যাইয়া দেখেন যে, সমস্ত ভক্তলোক জিনিষ পত্রসহ একে একে গাড়ীতে চড়িয়া ঐ বাড়ী হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার

ষ্টিমার এভিমুখে চলিয়া যাইতেছেন এবং সর্ব্বশেষে গোস্বামীর গাড়ী যেন একটী ধর্ম্মের প্রভাব বহন করিয়া নিয়া গেল। ইহারপর আর কেহ ঐ ত্রিতলোপরি গেরুয়াবসন ও গেরুয়া রঙ্গের কম্বলাদি সূর্য্যোত্তাপে শুকাইতে দেখেন নাই। বামাসুন্দরী হাস্পাতালে থাকিয়াই পতিমুখে গোস্বামীজির ধর্ম্মময় জীবন ও তৎসম্বন্ধে বিবিধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কঠিন রোগযন্ত্রণার মধ্যে সাধুলোকের বার্ত্তা শ্রবণ ও তদীয় কৃপাকটাক্ষ লাভ একরূপ মহৌষধি স্বরূপ।

ইহার কয়েক দিবস পর একক্রমে, অনেকদিন হাস্পাতালে থাকিয়া বিরক্তি বোধ হওয়াতে বামাসুন্দরী দুই সপ্তাহের জন্য বাসায় আনীতা হইয়াছিলেন। তৎকালে কাছাড় স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র কৃষ্ণকিশোর চন্দ ও যোগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি সকলেই নানাবিষয়ে বামাসুন্দরীর সাহায্য করেন। এই সময়ে এক দিবস পূজ্যপাদ মহাত্মা শিবনারায়ণ পরমহংস কৃপা করিয়া পণ্ডিতপত্নীকে আসিয়া দর্শন দেন। ইনি বামাসুন্দরীর ধর্ম্মপিপাসু জামাতা গিরিশবাবুর সম্মানিত গুরু এবং অতি তেজস্বী মহাপুরুষ। এই মহাত্মাকে দর্শন করিয়া দেবী তদীয় পবিত্র পদধূলি গ্রহণের নিমিত্ত সমুৎসুকা হইলে পরম কৃপালু পরমহংস দেব আপনিই অগ্রসর হইয়া সেই উত্থানশক্তি রহিতা পণ্ডিত-ভার্য্যার মনোরথ পূর্ণ করেন এবং অতি সুমিষ্ট ও শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মালাপদ্বারা পতি-পত্নী উভয়কেই কৃতকৃতার্থ করিয়া যান। ইনি একদিকে যেমন তেজস্বী

তেমনি আবার মাধুর্য্যভাবে পরিপূর্ণ, মানবাত্মার প্রকৃত কল্যাণ কিসে হয়, তাহাই তিনি অনেক সময়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। ইঁহার প্রচারিত সারনিত্যক্রিয়া ও কল্যাণ গীতা প্রভৃতি অতি উপাদেয় লোকহিতকর গ্রন্থ। এই মহাপুরুষেরই নিকট আমেরিকা হইতে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আগতা উইর্ল্ডনি বিদ্যাবতী প্রবীণা মেম কিছুদিন যোগচর্য্যা ও যোগের নিয়মাদি শিক্ষা করিয়া যান। তাহারপর পণ্ডিত-পত্নী বামা-সুন্দরীরও স্বর্গারোহণের কিছু দিন পূর্ব্বে দেবীর তনুত্যাগ সময়ে কি নিয়মে পরমাত্মার শরণাপন্ন হইতে হইবে, এতদ্বিষয়ে সেই পরমকৃপালু ঋষি লিখিয়া জ্ঞাপন করেন। ফলে এতদ্দ্বারা সেই পরলোকযাত্রী পণ্ডিত-ভার্য্যা অত্যন্তই অনুকম্পিতা হইয়াছিলেন। মৃত্যুদ্বারে শয়ন করিয়া এইরূপ মহাপুরুষের কৃপাকটাক্ষলাভ বড় অল্প ভাগ্যের কথা নয়।

যাহাহউক ঐ মধ্যযোগে কলিকাতার ছাত্রদিগের মেসে অবস্থানকালে একজন দেশীয় সর্ব্বজন প্রশংসনীয় সুবিজ্ঞ ডাক্তার বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য অত্যন্ত যত্নের সহিত বাসায় বামাসুন্দরীর চিকিৎসা করেন। তজ্জন্য ইঁহারা পতি-পত্নী উভয়েই এই মহাত্মার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ ইনি যে একদিন সপরিবারে আসিয়া আন্তরিক ভালবাসা ও আদর দেখাইয়া যান, সেই কথাটী তাঁহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই।

কাছাড়ের সুযোগ্য এঃ এঃ কঃ মহাত্মা জগচ্চন্দ্র দাস

মহাশয় এই সময়ে সপরিবারে কলিকাতায় যান। ইঁহারাও পতি-পত্নী উভয়েই হাস্পাতালে যাইয়া এবং বাসায় আসিয়া এই পণ্ডিতভার্য্যার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন এবং নানা প্রকারে সাহায্য করিতেও ত্রুটি করেন নাই। এই মহাত্মার সহধর্ম্মিণী একটী দেবতার ন্যায় উন্নত চরিত্রা লোক। আমরা জানি, ইঁহার সঙ্গে থাকিয়া প্রতিবেশী অনেক ক্ষুদ্র-কন্যারই অহঙ্কার ও অভিমান বিলয় পাইয়াছিল। যাহাহউক ইঁহার সঙ্গে বামাসুন্দরীর চিরদিনই অত্যন্ত প্রণয় ও সদ্ভাব; সুতরাং এইখানে আসিয়াও ইনি যতদূর পারেন তাঁহার এই অত্যাদরের দিদির প্রতি ভালবাসা দেখাইতে বা স্নেহ মমত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

তাহারপর বরাহনগর হইতে অন্তঃপুর পত্রিকার সম্পাদিকা বনলতা দেবী স্বীয় জীবনসহচর (বামাসুন্দরীর মাসী-পুত্র) শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে একদিন হাস্পাতালে আসিয়া বামাসুন্দরীকে দেখিয়া যান। তাঁহারও সেই বিনয়, মধুর চরিত্র ও সুমিষ্ট আলাপে পণ্ডিত-পত্নী অত্যন্ত আহ্লাদিতা হন। আবার ওদিকে বনলতা দেবীও এক পত্রে বামাসুন্দরীর স্বামীর নিকট লিখিয়াছিলেন—"রোগশয্যায় শায়িতা যে দেবী প্রতিমা একদিনমাত্র দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যাঁহার সরল স্নেহ ও মধুর ব্যবহারে হৃদয় জুড়াইয়া গিয়াছিল।" ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই অনুমিত হইতেছে, স্বল্পক্ষণের জন্য হইলেও এই সম্মিলনে ইঁহারা উভয়েই পরমসুখী হইয়া

ছিলেন। বস্তুতঃ যেখানে বা যে সূত্রেই হউক নারীজাতির সপ্রণয় সুমিষ্ট কোমল ব্যবহার অতি আনন্দপ্রদ।

এই সময়ে নাছিরনগরনিবাসী সরল ধর্ম্মমনা বাবু শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ও হাস্পাতালে এবং বাসায় আসিয়া সততই বামাসুন্দরীর প্রতি সুমধুর মমত্ব প্রদর্শন করিতেন। ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা কৈলাশবাবু দুইজনই বামাসুন্দরীর অতি আদরের পাত্র। বামাসুন্দরী তদীয় স্বামীর নিকট সর্ব্বদাই ইঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের প্রশংসা করিতেন।

যাহাহউক অবশেষে যখন দেখাগেল, এই অজস্র ঔষধ বর্ষণ ও একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের চিকিৎসাতে ও ব্যাধির উপশম হইল না, তখন যাহা হইয়াছে তাহাতেই কৃতজ্ঞ হইয়া পতিপত্নী আবার শিলচরেই ফিরিয়া তৃষিত সন্তানদিগকে দেখা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং যথাসময়ে হাস্পাতাল হইতে বিদায় হইয়া ঈশ্বরেচ্ছার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর ক্রমে ষ্টীমার আরোহণ করেন। এই প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে মধ্যে মধ্যে ষ্টীমার হইতে নামিয়া দেশের বন্ধুবান্ধব অনেককেই দেখা দিয়া আসিবার জন্য নানাস্থান হইতে অনুরোধ ছিল, কিন্তু ঐ কাতরাবস্থায় কোথাও নামিতে আর তাঁহাদের সাহস হইল না। বামাসুন্দরী পথে পথে কেবল অশ্রুপাত করিয়াই তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। পরে কেবল একমাত্র ফেঁচুগঞ্জে নামিয়া একান্ত স্নেহ-মমতার নিধান জামাতা দুর্গাচরণ বাবু ও তৎসঙ্গীয় তাঁহার তিনটী পুত্র-কন্যার সহিত সম্মিলিতা

হয়েন। আহা, এই মাতৃবৎসলা শিশুরা স্নেহময়ী জননীর দর্শনার্থ যেন কত পিপাসু হইয়াই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহাদের মাতা কঠিন রোগাক্রান্তা, আর ফিরিয়া আসিবেন কিনা তাহাই সংশয়ের স্থল, এই অবস্থায় কাহারও না প্রাণে আতঙ্ক হইয়া থাকে। যাহা হউক এই ষ্টেশনে বামাসুন্দরী তাঁহার এই স্নেহাস্পদদিগকে পাইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আর দেখা গিয়াছে, খুব দুঃখের মধ্যে নিপতিতা থাকিলেও আদর অভ্যর্থনা করিতে তিনি ভুলিতেন না এবং আমোদ আহ্লাদ বড়ই ভালবাসিতেন। ঐ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও জামাতৃকৃত সদ্ভাবে চিত্তার্পণ করিয়া দুই দিবস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তিনটী পুত্র কন্যাসহ শিলচরে প্রস্থান করেন। অপর জামাতা বাবাজি এবং সুশীলা চারুপ্রভা দুইজনেই স্নেহময়ী মাতাকে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে ও অতি কষ্টে শ্রীহট্ট প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর জীবনসহচর স্বামী পীড়াসহ পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক বন্ধুসঙ্কুল কর্ম্মস্থান শিলচরে যাইয়া স্বীয় আবাসে উপস্থিত হন। এইখানে তাঁহার বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই, এই স্থানে আসিলে পর প্রতিবেশী মেয়েরা বিশেষতঃ দেবীর দুইটী বৈদ্যজাতীয়া ধর্ম্মকন্যা অতি যত্নের সহিত ইঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্তা হন। আর এই সময়ে একজন হোমিওপ্যাথিক বহুদর্শী ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হয়। এই চিকিৎসা ও শুশ্রূষার প্রভাবে বামাসুন্দরী মধ্যযোগে বেশ

একটু সবল হইয়া নিজ শক্তিতেই সমস্ত বাড়ী বেড়াইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পীড়া অতি দুরারোগ্য, সুতরাং দেবীর এই উপশম ও আরোগ্য লাভ সাময়িক মাত্র, অল্পদিনমধ্যেই আবার রক্তস্রাব ও আবারই কাতর হইয়া পড়েন। এক দিবস একবারে সংজ্ঞাশূন্য বাক্-রোধ ও শরীর শীতল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; তখন সেই বিচক্ষণ বহুদর্শী ডাক্তার প্রসন্নবাবু আসিয়া পা দুইখানি গরম জলে ডুবাইয়া রাখাতে মুহূর্ত্তমধ্যে দেবীর পূর্ব্ববৎ চেতনা ও বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়। ফলে এই দিনের অনুষ্ঠানে সকলেই প্রসন্ন-বাবুকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। আর এই সঙ্গে বামাসুন্দরীর স্বামীর বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশী ভদ্রকন্যাদের ও চেষ্টা উদ্যোগ ও ব্যাকুলতার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ধন্য বাদার্হ। ফলে বহু ধনীর ঘরেও এত যত্ন ও এত শুশ্রূষা কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে কিনা সন্দেহ। এই কাতরাবস্থার সময়ে বহুদূর হইতে স্নেহাধার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এবং সদাত্মা জামাতা শরৎবাবু এবং দুর্গাচরণবাবু পত্নীসহ আসিয়া একে একে সকলেই জন্মের মত মাতাকে দেখিয়া যায়। এই সময়ে শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভাও আসিয়া মাতার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্তা হইয়াছিলেন। তাহার কতিপয় দিবস পরে জামাতা গিরিশ-বাবুও আসিয়া স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতাকে জন্মের মত নমস্কার করিয়া যান।

তৎপর আশ্বিনের শেষভাগে ডাক্তার প্রসন্নবাবু স্বদেশে

চলিয়া গেলে বামাসুন্দরীর ধর্ম্মকন্যা বসন্তকুমারীর স্বামী সুবিজ্ঞ কবিরাজ হরিমোহন সেন আয়ুর্ব্বেদীয় বিধানমতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি তাঁহার এই ধর্ম্মতঃ শ্বশ্রূমাতাকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তজ্জন্য এই মহাত্মা সর্ব্বশেষে অত্যন্ত যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন। শুশ্রূষাও তাঁহারই নির্দ্দেশমতে তদনুরূপ হইতে থাকে। এই সময়ে বামাসুন্দরীর নিজ কন্যা স্বর্ণ-প্রভা, ধর্ম্মকন্যা দুইটী ও তাঁহার চিরসঙ্গিনী এবং অত্যন্ত প্রণয়িনী এক বাটীকায় অবস্থিতা চিরোপকারী বাবু রমেশচন্দ্র ভদ্র মহাশয়ের স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই যাঁহার যতদূর সাধ্য সাহায্য ও শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যে ভয়ঙ্করী পীড়া কিছুতেই তাহার প্রকোপ থামিল না। ক্রমেই তিনি দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। অতঃপর সেই প্রেমমোহিত জীবনসহচর স্বামী যখন দেখিলেন প্রিয়তমা পত্নীর আর কিছুতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই, তখন যাহাতে পারত্রিক মঙ্গল হয় ও তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করে, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে বামাসুন্দরী নিজেই এক দিবস স্বামীকে বলিয়া কিছু দেবার্চ্চনা ও কয়টী ব্রাহ্মণভোজন করাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহা অবশ্যই অবস্থানুসারে যতদূর হইতে পারে হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গে দেবী একটী পঞ্চগব্য করিয়া তাঁহার সেই পরলোকোন্মুখ জীবন প্রক্ষালন করেন। এই পঞ্চগব্য ক্ষুদ্রা-

কাবে একটা প্রায়শ্চিত্ত; বামাসুন্দরী দেবী মধ্যে মধ্যে প্রায়ঃ দেহমন শুদ্ধির জন্য এই অনুষ্ঠান করিতেন।

অবশ্য অধুনা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন, ইহা এক ভয়ানক কুসংস্কার ও নিতান্ত জড়বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত, ইহার মধ্যেও কিছু উন্নতজ্ঞান বিজ্ঞানের কথা অবশ্যই আছে। বেদান্ত শাস্ত্রের নির্দ্দেশমতে এই দেহ মাতৃ-পিতৃ ভুক্ত অন্নেরই সার হইতে উদ্ভূত এবং অন্নেতেই নিয়ত পরিপুষ্ট, সুতরাং ইহা একটী অন্নময় কোষ। এই অন্নময় কোষকেই আশ্রয় করিয়া প্রাণময় কোষ অর্থাৎ প্রাণন ব্যাপার চলিতেছে। তৎপর এই প্রাণময় কোষেরই অভ্যন্তরে মনোময় কোষ অর্থাৎ মনন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহারপর এই মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ ও তাহার অভ্যন্তরে বা তাহাকে আশ্রয় করিয়া আনন্দময় কোষ বিদ্যমান। এই পঞ্চকোষের পরস্পর সম্বন্ধ এবং সন্নিবেশ জানা থাকিলেই আর্য্যজাতির দেহশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ মন ও বুদ্ধির বিশোধন এবং প্রায়শ্চিত্তেরও সফলতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। নিশ্চয়ই ইহা কোন এক অন্ধবিশ্বাসের কথা বলা হইতেছে না, সুসভ্য খৃষ্টসম্প্রদায় যেরূপ বিশ্বাস করেন, যীশুর প্রাণ দানই জগতের প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বাস্তবিক সেই প্রণালীর কথা নয়; এইখানে দাদার জ্ঞানে বিষ নামিবার কোন কথা নাই। ইহা অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান, সকলেই দেখিয়া আসিতেছেন, উগ্রবীর্য্য বা সতেজ বিশেষ

বিশেষ বস্তুর ব্যবহারে সর্ব্বদাই শরীর মন ও বুদ্ধির পরিচালন ও বস্তুর গুণানুসারে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সুতরাং পঞ্চগব্যেতেও যে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন এবং বুদ্ধির জড়তা নাশ করিয়া আত্মাতে একটী সংশোধিত অবস্থা আনয়ন করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি। আয়ুর্ব্বেদে যাঁহাদিগের বিশেষ জ্ঞান আছে ও বস্তুবিজ্ঞান যাঁহারা অবগত আছেন, সেই সম্মানিত আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত কুল জানেন; পঞ্চগব্যের উপাদান গোময়, গোমূত্র এবং দধি দুগ্ধ ঘৃত এই পাঁচটী দ্রব্যেরই বিশেষ বিশেষ গুণ আছে এবং তাহা আবার শোধন করিবার সময়ে কুশাগ্রদ্বারা আলোড়িত করাতে আরও একটু উপাদেয় গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা মেস মিরীজম ও হেকিমী রীতিতে চিকিৎসা করেন, তাঁহারা বলেন, অঙ্গুল্যগ্র, কুশাগ্রভাগ ও মেষ লোমাদিতে তাড়িতাকর্ষণ ও তাড়িতশক্তির প্রক্রিয়া অসাধারণরূপে সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কুশাগ্র যোগে পঞ্চগব্য শোধনেও যে একটু বিশেষতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন ঐ গোময় গোমূত্রাদির জ্ঞানগর্ভ বিশিষ্ট পরিমাণ থাকাকে, তাহাদের একটা রাসায়ণিক সমবেত শক্তিও আমরা একবারেই অস্বীকার করিতে পারি না।

যাহা হউক ইহার পর সেই শুদ্ধমনা দেবীরই আকাঙ্ক্ষা মতে রোজ সায়ংকালে তাঁহার শিয়ঃ স্থানে গঙ্গাজল তুলসী স্থাপন করিয়া ধূপদীপ প্রদান করা হইত; তিনি

তৎসন্নিধানে শায়িত অবস্থাতেই অবস্থিতা থাকিয়া কাতরভাবে ইষ্ট দেবতা স্মরণ করিয়া ভক্তি দিতেন। অতঃপর সেই সদ্ভাব ও পত্নীর ভক্তি শ্রদ্ধার অভিমুখীন হইয়া তৎকালে স্বামী ও আবার সেই পরলোক যাত্রি জীবন সহচরীর শিরঃস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক তদীয় আত্মাতে সদ্ভাব উদ্রিক্ত করিয়া এক অধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। অবশ্য সকলেই জানেন, আর্ত্ত ও ভয়হৃদয়ের ধর্ম্ম কর্ম্ম অধিকতর প্রাণস্পর্শী ও অকৃত্রিম। যোগশাস্ত্রেরও নির্দ্দেশ এই; সুকৃতি লোকেরাই ভগবানকে ভজন করে এবং তাদৃশ লোক চতুর্ব্বিধ ও তন্মধ্যে প্রথমেই আর্ত্ত ব্যক্তির উল্লেখ আছে। ইহারও প্রকৃত ভাব এই যোগাদ্যভিভূত আর্ত্ত ব্যক্তির যদি পূর্ব্বের সুকৃতি থাকে, তবে সেই কাতরাবস্থাতেও তাঁহার ভজন প্রবৃত্তি জন্মে। বস্তুতঃ যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এই সময়ে সেই কল্যাণময়ীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একটু প্রবলা হইয়াছিল, তিনি আর এক দিন সংকীর্ত্তন শুনিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাহাতে তদীয় জীবন সহচর স্বামী তদ্দিবসেই সায়ংকালে স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক অতি আনন্দ সহকারে পুষ্পাদি দ্বারা গৃহ সুসজ্জিত করিয়া ধূপদীপ প্রজ্জালন পূর্ব্বক একান্ত সদ্ভাবে যতদূর সাধ্য, ধর্ম্মের বার্ত্তা প্রিয়তমা পত্নীকে শুনাইয়া দেন। এবং পরিশেষে একটী সুকণ্ঠ গায়ক বন্ধু হরি নামাঙ্কিত কয়টী সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করেন। এই নাম সুকীর্ত্তনে দেবীর বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। ইহার পরেও স্বামী

নসীমায় আগতা পত্নীকে কিরূপে ও কি দিয়া পরিতুষ্ট য়া দিবেন, অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা তাহাই অনুসন্ধান তেন।

শেষাবস্থায় বামাসুন্দরীর রাত্রিতে নিদ্রা বড়ই কম হইত, তিনি প্রতি রজনীতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া তদীয় স্বামীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন। কোন দিন বা উভয়েই উভয়ের কাছে সময়ে সময়ে যে অন্যায় অপরাধ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া উভয়েই মার্জ্জনা চাহিয়াছেন এবং প্রেমপ্লুত হইয়া দুই জনেই অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। কোন কোন দিন বা ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কোন অবস্থায় কিরূপ থাকিয়া গেলেন, সেই সুখ দুঃখের কাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইত। বামাসুন্দরী অনেক প্রস্তাব জানিতেন, তন্মধ্যে কোন কোনটীতে অতি সুন্দর ধর্ম্মবিশ্বাস ও পরলোক ঘটিত কথা সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা তিনি ঐ রাত্রিযোগে কথাপ্রসঙ্গে প্রিয়পতির নিকট বলিতেন এবং শেষে দুই জনেই তাহার মর্ম্ম লইয়া সমালোচনা করিতেন।

একদিন পরকালের কথাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত ভার্য্যা প্রিয়তম জীবন সহচরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আচ্ছা বলুন তো, পরলোক কিরূপ? ইহার তত্ত্ব শুনিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। তাহাতে স্বামী বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই পরলোক সুখময় আনন্দধাম। মনে করিয়া দেখ, তাহার জন্য মুনি

ঋষি ও যাবতীয় সাধু সন্তান সকলেই আশান্বিত; যোগীর যোগ, তাপসদিগের কঠোর তপস্যা, সজ্জনদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সাধ্বী নারীকুলের পাতিব্রত্য এবং যাবতীয় ব্রতচর্য্যা সকলেরই উদ্দেশ্য মনোহর পরলোক প্রাপ্তি। সকলেই যেন আশা করিতেছেন, কোন প্রকারে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিলেই সেই আনন্দধাম লাভ করিবেন। তাহারপর ঈশ্বরের দিকে তাকাইলেও দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর মানুষকে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার বশবর্ত্তী করিয়া এই সংসারে আনিতেছেন, তেমনি তাহার জন্মিবার পূর্ব্বেই তাহার সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণেরও একটা উপায় বিধান করিয়া রাখেন। তবেই একবার ভাবিয়া দেখ, শরীর সম্বন্ধে মানুষের যত প্রকার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য যদি ঈশ্বর অগ্রেই তাহার উপায় করিয়া রাখিলেন, তবে শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ যে আত্মা তাহার আকাঙ্ক্ষা কেনই না পূর্ণ করিবেন। বস্তুতঃ লোকের এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দৃষ্টেই অনুভূত হইতেছে যে, নিশ্চয় পরলোক মনোহর ও আনন্দে পরিপূর্ণ।

দেবী আর এক দিবস রাত্রির আহারান্তে স্বামীর সহিত নানা কথা আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভাল আপনি তো আমার বীজমন্ত্রটী জানেন, ইহার অর্থ আমাকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিউন। তাহাতে স্বামী অতি আহ্লাদিত হইয়াই তাঁহার বীজ মন্ত্রের প্রতি অক্ষরের অর্থ করিয়া সমুদায় যুক্ত বর্ণের অর্থ বলিয়াদিয়াছিলেন যে, ইহার

অর্থ "সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী ত্রিগুণময়ী মহাশক্তি"। আর তাহার সহিত "অনুস্বার বা অর্দ্ধ চন্দ্রের মধ্যস্থিত নাদ বিন্দুর অর্থ গুণাতীত পরব্রহ্ম"। তবেই এক্ষণে বুঝিয়া রাখ তোমার এই সমস্ত বীজ মন্ত্রটীর অর্থ হইল, 'যিনি সৃজন, পালন এবং সংহার করিতেছেন, সেই ত্রিগুণময়ী মা, এবং নির্গুণব্রহ্ম। কালীপ্রতিমাতে নীচে যে নিষ্ক্রিয় পুরুষটী দেখিয়াছ, সেই সদাশিবই নির্গুণ ব্রহ্ম; আর তদুপরি বা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এক দিকে বরাভীতি হস্তে মঙ্গল করিবার ইচ্ছা ও অন্য দিগে খড়্গ এবং অসুর মুণ্ড হস্তে অমঙ্গল বিনাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে করিতে যিনি দর্শন দিতেছেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মা। ইহারও গূঢ় অর্থ এই, সৃষ্টির আদিতে যিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তিনিই সৃষ্টির অবস্থায় ত্রিগুণ মহিমায় ব্যক্ত। এই দুয়ের নিত্য যোগ দেখাইবার জন্যই এই দ্বন্দ্বীভূত শিবশক্তি রূপ মূর্ত্তি যন্ত্রের গঠন হইয়াছে। বস্তুতঃ নির্গুণ সগুণ কেবল অবস্থা ভেদ মাত্র, স্বরূপতঃ একই বস্তু।"

এই গুণময়ী প্রকৃতি আর নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক ভাবটী বাস্তবিক কিছু জটিল ও অতি গভীর অর্থযুক্ত। ইহার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা বড় সহজ কথা নহে। কেহ বলেন একমাত্র ঈশ্বর এই জগতের কর্ত্তা; আর কেহ বলেন ঈশ্বর কিছু নহে প্রকৃতি হইতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে; আবার অনেকে বলেন চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম ও

গুণময়ী প্রকৃতি এই উভয়ের যোগে এই জগতের সৃষ্টি। আবার অন্যেরা বলেন একই ব্রহ্ম যিনি সৃষ্টির আদিতে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তিনিই সৃষ্টির অবস্থায় সগুণ ভাবে লীলা করেন। যাহা হউক এই বিষয়টী বামাসুন্দরীর জানিবার পিপাসা হইয়াছিল, তিনি তদবস্থায় এই দুরূহতত্ত্ব যাহা কিছু বুঝিয়া থাকুন তাহাতেই তাঁহার লাভ। কিন্তু হায়, যত দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন মৃত্যু তাঁহার সন্নিকট প্রতীত হইতেছিল, এবং তিনিও যেন তদর্থই প্রস্তুত হইতেছিলেন।

শেষ অবস্থায় বামাসুন্দরীর যেমন নিদ্রা কম হইত, তদীয় স্বামীরও যেন প্রাণে তখন একটা উৎকণ্ঠা ছিল, তিনিও নিদ্রায় একেবারে অভিভূত হইতেন না, প্রায়ই জাগিয়া প্রিয়তমার খবর লইতেন এবং জাগিলেই উভয়ের মধ্যে নানা প্রসঙ্গে আলাপ হইত। এক দিবস বামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আমাকে বলুন তো মৃত্যুকালে কিরূপে ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। তাহাতে দেবীর সেই জীবনসহায় সুহৃদ্ বলিয়াছিলেন, গীতাতে তারক ব্রহ্মযোগ নামে একটী অধ্যায় আছে, তাহাতে বর্ণিত আছে—ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্রটী মনে মনে জপ ও একাগ্রচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক যখন টের পাওয়া যায়, শরীর ক্রমেই অবশ হইয়া আসিতেছে, আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন আর কোন দিকেই মন না দিয়া খুব

দৃঢ়রূপে ঈশ্বরেতে চিত্তার্পণ পূর্ব্বক ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম-বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা প্রাণের মধ্যে ধারণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রমতে ইহাই উৎকৃষ্ট ও একান্ত প্রশংসনীয় মৃত্যু। যত যোগী ঋষি বা মহাপুরুষ সকলেই এই যোগ পথে পরমাত্মাকে আশ্রয় করেন। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই, জগদীশ্বরের যত যত নাম আছে, তন্মধ্যে ওঁ এই নামটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই 'প্রণব মন্ত্রটারও অর্থ সৃষ্টিস্থিতি লয়কর্ত্তা ব্রহ্ম। তাহার পর' সেই জীবন সহায় স্বামী প্রণবটী বার বার উচ্চারণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, গান্ধার রাগিণীতে ইহা গান করিতে হয় এবং শেষ স্থিত হসন্ত মকারের উচ্চারণ সানুনাসিক ও ঠিক বীণাধ্বনির মত শ্রুতিমধুর হওয়া আবশ্যক। আর আর সমস্ত উচ্চারণগুলি পিপীলিকার সারির ন্যায় ধারাবাহী হইলেই উত্তম হয়। ইহাই ব্রহ্মধারণা এবং যোগাভ্যাসের প্রণালী।

দেবী এইরূপেই জীবনের কথাবার্ত্তা পূজ্যপাদ জীবন-সহচরের নিকট শুনিতে শুনিতে একেবারে অন্তিমদশায় আসিয়া উপস্থিত হন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্নেহের কন্যা স্বর্ণপ্রভাকে সেবা শুশ্রূষায় নিরতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, না গো, তোমরা আমার জন্য যতই চেষ্টা কর, না কেন, আমার সময় নিকট আসিয়াছে, আমার আর এই থানে থাকিতে যেন ভাল লাগিতেছে না ভিতরে ভিতরে আমার যেন এইক্ষণে পরলোকের জন্যেই একটা

টান পাড়য়াছে। আমি এইক্ষণে আমার ঐ স্বর্গবাসী প্রাণের ধন সকলকেই অতি নিকটে দেখিতেছি। মা! তোমরা কোন চিন্তা করিও না, ঈশ্বর আছেন, তিনি রক্ষা করিবেন। ইত্যাদি স্নেহমধুর বাক্য বলিতে বলিতে সেই সন্তানবৎসলা মাতার দুই অক্ষি দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে প্রিয়তমা ভার্য্যা এক দিবস বলিয়া রাখিয়াছিলেন, আমার মৃত্যু হইলে কিন্তু হরি-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাকে দাহ করিবেন। আর যাহাতে আমার সদ্গতি হয়, তাহা আপনি করিবেন। এই কথা বলিয়া দেবী অবিরলধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। অহো, ভাগ্যবতীর এই সদিচ্ছা ও প্রেমাশ্রু বড়ই বহুমূল্য পদার্থ। এই স্থানে তাঁহার সেই প্রেমাস্পদ স্বামীও অশ্রুপাত না করিয়া পারেন নাই।

তাহার পর শরীর অধিকতর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। কার্ত্তিকের সংক্রান্তি দিবস সায়ংকালে একেবারেই শরীর অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। তখন সেই একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবন-সহচর দেবীর শিরঃস্থানে শান্তভাবে বসিয়া গীতাখানা একবার পাঠ করিলেন। তৎপর আর সময় নাই দেখিয়া ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গ দেবীর মুখে গঙ্গাজল তুলসী প্রদান করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আনয়ন করেন। তখন আর কি, মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই দেবীর

অন্তরাত্মা এই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিল। অহো, এত ভালবাসা ও এত আদরের বস্তু পলকের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। সুহৃদোব তখন বস্ত্র দ্বারা দেবীর শরীর আচ্ছাদিত করিলেন। এই সময় সন্তানেরা ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল। আর সেই প্রেমাস্পদ স্বামী তখনও দুইবার বস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া ঐ প্রিয়মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পর বন্ধু বান্ধব যাহারা আসিবার ধীরে ধীরে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে মাতার অতি আদরের রোরুদ্যমান সন্তানেরা একে একে জন্মের মত সেই স্নেহময়ী জননীর চরণে প্রণিপাত ও পদধূলি গ্রহণ করিলে সুহৃদ্‌গণ দেবীর পূর্ব্ব নির্দ্দেশ ও আকাঙ্ক্ষামতে হরি-সংকীর্ত্তনের আযোজন করিয়া ঐ অত্যাদরের পবিত্র সতীদেহ শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। এবং তথায় যাইয়া কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সামবেদীয় বিধান অনুসারে তীর্থ-বারি আহ্বানপূর্ব্বক মাতার পরিত্যক্ত দিব্য দেহ তিল তুলসী ও কুশমিশ্রিত পবিত্র জলে অভিষিক্ত ও স্নাত করাইয়া দিলে, নববস্ত্র পরিধান ও তৈল সিন্দূর প্রদান পূর্ব্বক দেবীতনু অতি সমাদরে নীয়া চিতায় সংস্থাপিত করা হয়। তাহার পর সেই প্রিয়পুত্র যজ্ঞকুণ্ড সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই

সময়ে সেই পুণ্যক্ষেত্রে কোন কোন শ্মশানবন্ধু এমনই ভাবের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন যে, সেই নৃত্যে মায়ামোহের তীব্রতা যেন অপসারিত করিয়া দিয়াছিল। প্রেমের চক্ষে এই নৃত্য বড়ই এক সুদৃশ্য ব্যাপার। প্রকৃত পক্ষে এই স্বর্গের দ্বার শ্মশানই নৃত্য করিবার উপযুক্ত স্থান।

যাহা হউক ভূলোকবাসীর পক্ষে ইহা নিতান্তই একটী চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় যে, মানবাত্মার এত প্রিয় ও এত আদরের দেহটী অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা হয় কেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু কবরস্থ শরীর লইয়া পুনশ্চ উত্থিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণও বিশ্বাস করেন, আখেরীতে সমস্ত আদমী কবর হইতে উঠিয়া বিচারে নীত হইবে। সুতরাং বলিতে হইবে, ইহাদের উভয় মতেই মৃত শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যায় না। কিন্তু তাহা সত্য হইলে হিন্দু যে শবটীকে ভস্মসাৎ করিয়া একেবারে আত্মার পার্থিব আকর্ষণ রহিত করিয়া দেন, এই উদ্দেশ্য অতি মহৎ এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এতদ্ভিন্ন আর্য্য-বিধান মতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পুত্রাদি স্নেহপাত্রদিগের রোদন করাও অত্যন্ত এক নিষিদ্ধ কার্য্য; কেন না তাহাতে মৃতাত্মা পৃথিবীর অভিমুখে পুনশ্চ আকৃষ্ট হইতে পারে। ইহাতে দেখা যায়, দাহ করা এবং রোদন নিষেধ এই দুইটীই মৃতাত্মার ঊর্দ্ধ-গতির অনুকূলে যোগনেত্র ঋষিদিগের অতি জ্ঞানগর্ভ প্রবর্ত্তনা।

তৎপর অশৌচ ধারণ এবং ক্রিয়া গ্রহণ অর্থাৎ পুত্রাদির কুশাসনে বা অজিনে শয়ন ও অতি নিষ্ঠার সহিত হবিষ্যাহার করিয়া প্রাণ ধারণ, এই সমস্তই মৃতাত্মার অভিমুখী হইয়া তদায় শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকরণে অধিকারী হইবার জন্য ফলে একটী অশরীরী আত্মার অভিমুখে 'সৎক্রিয়াজনিত সুকৃতি বা অপূর্ব্বতা প্রেরণ করিতে হইলে ক্রিয়াকর্ত্তার একটু অন্যান্য বিজ্ঞানসহ সূক্ষ্মতায় আরূঢ় হওয়াই কর্ত্তব্য।

অশৌচ ধারণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, যাহার জ্ঞান যত বেশী, তাহার অশৌচ সেই পরিমাণে কম ইহারও বিশেষ প্রমাণ এই মায়ামোহ হইতে বিমুক্ত যোগী সন্ন্যাসী দিগের এক বারেই অশৌচ হয় না।

ইহার পর অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কর্ম্মকর্ত্তা অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত এবং অগ্নিগোহিরণ্য ও ঘৃতাদি স্পর্শ করিয়া আপনার মধ্যে আরও একটু আধ্যাত্মিক তেজ ও শুচিত্ব প্রবর্ত্তিত করিয়া নেন। তৎপর তিলতুলসী ও কুশ মিশ্রিত মন্ত্রপূত শান্তিবারিতে শরীরটী পূত করিয়া আচমন পূর্ব্বক দানাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। জ্ঞানিগণ জানেন, শ্রদ্ধার সহিত অন্নাদি দানের নামই শ্রাদ্ধ। দান অবশ্য সকল দেশেরই অতি প্রশস্ত সৎক্রিয়া, কিন্তু তাহাতেও আর্য্য জাতির এই অনুষ্ঠান একটু স্বতন্ত্র; তাঁহারা এক একটী দানীয় বস্তু সাক্ষাতে করিয়া অগ্রে যাঁহাকে দান দিবেন, তাঁহাকে অতি সমাদরে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করেন। ইহাতে দাতা ও

গৃহীতা উভয়েরই মধ্যে সদ্ভাবজনিত একটু আভিমুখ্য ঘটে। তৎপর দানীয় বস্তুটীকেও ফুলচন্দন দিয়া আদৃত করিবার বিধি। ইহার পর সেই বস্তুর আসল অধিপতি যিনি, সেই বিশ্বকর্ত্তা বিষ্ণুকেও গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করা হয়। তাহার পর তিলতুলসী ও কুশ সমেত বারিতে হস্ত দিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক মৃতাত্মার স্বর্গার্থ বস্তুটী দান করা হইয়া থাকে। দান অবশ্য অমন্ত্রকও হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ আত্মার অন্তস্তল হইতে শ্রদ্ধাভক্তি লইয়া দান নিশ্চয়ই স্বর্গীয় আত্মার অধিকতর তৃপ্তিকর। এই স্থলে ভূমি আসন জল স্বর্ণ বস্ত্র ও তাম্বুল প্রভৃতি দানীয় বস্তুগুলিও আবার অতি সুন্দর নিয়ত ব্যবহার্য্যরূপে মনোনীত করা হইয়াছে।

যাহা হউক এই আর্য্য রীতিতেই নির্দ্দিষ্ট একাদশাহে বামাসুন্দরীর তৃতীয়পুত্র যতীন্দ্রনাথ পিতার পঞ্চবটী ক্ষেত্রে অশ্বত্থমূলে বসিয়া দান ও চন্দনধেনুশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। এবং জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ তাহার কর্ম্ম স্থান অম্বালার সন্নিহিত ধর্ম্ম-ভূমি কুরুক্ষেত্রে যাইয়া মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ করেন। তদ্ভিন্ন দেবীর স্নেহের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা এবং শ্রীমতী চারুপ্রভা ও যথাসময়ে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে মাতার স্বর্গার্থ যাহা যাহা কর্ত্তব্য অতি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহার পর বামাসুন্দরীর ধর্ম্মকন্যা বসন্তকুমারী ইতিমধ্যে এক স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পূজনীয়া মাতা তাঁহার নিকট খৈ ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য তিনিও

স্বর্গীয়া রামাসুন্দরী দেবীর সমাধি ও তাঁহার পতি
পুত্র ও একটী কন্যা।

তাহার সেই অত্যাদরের মাতাকে খৈ দেওয়া উপলক্ষে অতি আড়ম্বরের সহিত ধর্ম্ম পিতার ঐ পঞ্চবটী ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ ভোজন ও দানাদি করিয়া পরিতুষ্টি লাভ করেন। তাঁহার পর, এই ভাগ্যবতী পরবৎসরেও বৎসরান্ত শ্রাদ্ধের পর একদিন ঐ পুণ্যক্ষেত্রে মাতার স্বর্গার্থ সংকীর্ত্তন করাইয়া বহু লোককে পরিতুষ্টির সহিত ভোজন করান। ঐ দিগে দেবীর স্বর্গগতা কন্যা মুক্ত কেশীর অনন্ত জীবনের সঙ্গী সদাত্মা জামাতা শরৎ বাবুও এক দিন গঙ্গাতীরে যাইয়া তাঁহার শ্বশ্রূমাতার জন্য যাহা কর্ত্তব্য কিছু করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের নীরব কার্য্য কর্ম্ম অপরের জানিবারও বিশেষ সুযোগ নাই।

যাহা হউক এই সমস্ত কার্য্য হইয়া গেলে পর বামাসুন্দরীর স্বামী স্বীয় পঞ্চবটী ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত দেবালয়ে স্বকীয় আসনে সংলগ্ন করিয়া দেবীর চিতা ভস্ম প্রোথিত একটী সমাধি প্রস্তুত করিয়া দেন। এই সমাধি সম্মুখে সমগ্র ভাগবত শিরে বামাসুন্দরীর হরিভক্ত পুত্র যোগেন্দ্র নাথের সমাধি। ইহার দক্ষিণে বামাসুন্দরীর অত্যাদরের বিদুষী কন্যা মুক্ত-কেশীর সমাধি। তাহার দক্ষিণে বামাসুন্দরীর তৃতীয়কন্যা হিরণ্যপ্রভার সমাধি। অধুনা স্বামী এই সমাধিক্ষেত্রে বসিয়াই প্রতিদিন প্রাতে তাঁহার আত্ম কার্য্য করেন। তৎপর পাঠ হয় এবং পাঠান্তে একটী ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাদিত হইলে দেবীর উপস্থিত পুত্রকন্যারা যাইয়া ঐ সমাধি সন্নিধানে ভূমিষ্ঠ ভাবে একে একে অগ্রে ভগবান বিষ্ণুকে ও তৎপর স্বর্গগতা জননীকে

প্রণাম দিয়া আনন্দ অনুভব করে। এই সমাধিটাই আবার, এক্ষণে দেবীর পিতৃতীর্থ সরিপ পুরে নিয়া চিরস্থায়িরূপে স্থাপন করিয়া রাখিবার জন্য স্বামী তথায় একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মনে করিতে হইবে, ইহাই আর্য্য-নারী বামাসুন্দরীর জীবনের শেষবার্ত্তা ও পৃথিবীর উপরে তাঁহার সর্ব্ব শেষ সমাদর।

আর্য্যা বামাসুন্দরীর পূজনীয় পিতৃদেব পর্য্যন্ত পিতৃকুলের পাঁচ পুরুষের নাম ।

১। অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ কামদেব দেবশর্ম্মা চৌধুরী ।

২। বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামচন্দ্র „ চৌধুরী ।

৩। প্রপিতামহ গোবিন্দরাম „ চৌধুরী ।

প্রপিতামহী সুভদ্রা দেবী ।

৪। পিতামহ রামনারায়ণ „ চৌধুরী

পিতামহী ভৈরবী দেবী ।

৫। পিতা গৌরচন্দ্র „ চৌধুরী ।

মাতা চিন্ময়ী দেবী ।

আর্য্যা বামাসুন্দরীর পূজার্হ পতিকুলে
পিতৃকল্প শ্বশুরদেব পর্য্যন্ত সাতপুরুষের নাম।

১। লোকনাথ দেবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্য

তৎপত্নী বিদ্যাবতী দেবী।

২। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাভূষণ

তৎপত্নী উমাশঙ্করী দেবী

৩। কামদেব বিদ্যানিধি

তৎপত্নী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী।

৪। জয়দেব দেবশর্ম্মা

তৎপত্নী সুলোচনা দেবী।

৫। নরহরি সার্ব্বভৌম

তৎপত্নী সুমিত্রা দেবী।

৬। রামহরি দেবশর্ম্মা

তৎপত্নী রুক্মিণী দেবী।

৭। পূজার্হ শ্বশুর চন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

শ্বশ্রূমাতা ভাগীরথী দেবী।